স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

অসুরক্ষিত সীমা
ও তিক্ততার বীজ
অক্ষত রেখেই
কার্যকর হচ্ছে
ভারত-বাংলাদেশ
স্থলসীমা চুক্তি

.....পৃষ্ঠা - ১২

গঙ্গা হতে
পারে জাতীয়
যোগাযোগ
পথ

...পৃষ্ঠা - ২৭

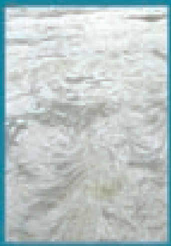

৬৭ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা।। ২২ জুন ২০১৫।। ৬ আষাঢ় - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাংলাদেশ সফর ও দু'দেশের সম্পর্ক

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, ৬ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২২ জুন - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

পাকিস্তানের ভয় ভারত একইভাবে অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে পারে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : 'কুল' থাকুন রাজা রামমোহন
□ সুন্দর মৌলিক □ ১১

অসুরক্ষিত সীমা ও তিক্ততার বীজ অক্ষত রেখেই কার্যকর হতে যাচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমা চুক্তি
□ সাধন কুমার পাল □ ১২

বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা জয় করে দিল্লী ফিরেছেন মোদী □ বাসুদেব ধর □ ১৫

প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর : প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা
□ সত্য মিত্র □ ১৭

ভারতমাতার আত্মিক মেলবন্ধনের স্থানগুলি
□ রবীন সেনগুপ্ত □ ২১

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে চন্দনেশ্বরের 'ভদ্র' দেউল
□ ড. প্রণব রায় □ ২২

শ্রীরাম জননী কৌশল্যা □ রূপশ্রী দত্ত □ ২৩

গঙ্গা হতে পারে জাতীয় যোগাযোগের পথ
□ এ মালিক □ ২৭

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি : অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ
□ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ২৯

নির্বোধ হুল্লোড় □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৩১

ন্যায়বিচার— একটি মৌলিক অধিকার
□ পুলক ঘোষ চৌধুরী □ ৩৬

লোকভাষা হতে চলেছে সংস্কৃত □ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাস

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গিদের সন্ত্রাস চলছেই। সম্প্রতি মণিপুরে সেনাবাহিনীর কনভয়ের উপর জঙ্গিদের আকস্মিক আক্রমণে ২০ জন জওয়ান শহীদ হয়েছেন। এর জবাবে ভারতীয় সেনাবাহিনী মায়নামার সীমান্ত অতিক্রম করে জঙ্গিদের প্রত্যাঘাত করেছে। সন্ত্রাস দমনে মোদী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি প্রত্যক্ষ করা গেল। এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায়, অভিরূপ নাগ চৌধুরী প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রত্যাঘাত

'ইট মারিলে পাটকেল খাইতেই হইবে'— এইটাই চিরকালের নীতি। কিন্তু সবসময় সেই নীতি মানিয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ প্রত্যাঘাত করিবার মতো সাহস এবং ক্ষমতা না থাকিলে প্রত্যাঘাত করা সম্ভব হয় না। অবশ্য চাণক্য প্রত্যাঘাতে উপযুক্ত সময়ক্ষণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তবু আঘাতের প্রতিরোধে প্রত্যাঘাত প্রয়োজন, কারণ প্রত্যাঘাত না করিলে আঘাতের মাত্রা বাড়িতে থাকে। আঘাত করিবার সময় আঘাতকারী মানবিকতার কথা বিবেচনা না করিলে প্রত্যাঘাতের ক্ষণে মানবিকতা চিন্তার প্রয়োজন নাই। কারণ শত্রুকে দয়া দেখাইবার পরিণাম ইতিহাসে বহু রহিয়াছে। এই বিষয়ে ইতিহাস হইতেই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হিসেবে ইজরায়েলকে আদর্শ হিসেবে সকলের মানিয়া লওয়া উচিত। ভারতবর্ষ শান্তির দেশ হইলেও মেরুদণ্ডহীনতা তাহার আদর্শ হইতে পারে না। সম্প্রতি মায়ানমারে জঙ্গি হানার প্রতিরোধে প্রত্যাঘাত লইয়া কোনো কোনো মহলে আলোচনা চলিতেছে। বিশেষত পাকিস্তান সরব হইয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনার প্রয়োজন কোথায়? সন্ত্রাস দমনে সরকারের কোনোরকম সহিষ্ণুতা দেখাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সরকার নিজেও সন্ত্রাস দমনে 'জিরো টলারেন্স'-এর কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছে। তাই ভবিষ্যতে এমন অভিযান বারম্বার চালাইবার দরকার, যাহাতে জঙ্গি কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা যায়। রাষ্ট্রবিরোধী জঙ্গি হামলা বন্ধ করিবার নীতি এনডিএ সরকারের অভিন্ন কর্মসূচি। এই হামলা বন্ধ করিবার প্রয়োজনেই প্রথম দিন হইতেই প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত বন্ধুত্বের সুসম্পর্ক স্থাপন করিবার চেষ্টা চালাইয়াছে মোদী সরকার। যাহাতে জঙ্গি সংগঠনগুলি প্রতিবেশী দেশের সাহায্য না পাইতে পারে। মায়ানমারে সেনা অভিযান আসলে মোদী সরকারের এই প্রতিবেশী নীতিরই জয়। উত্তরপূর্ব ভারতে সক্রিয় একদল জঙ্গির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য মায়ানমার যে এত দ্রুত সায় দিয়াছে তাহা এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে গভীর বোঝাপড়া এবং সামরিক সম্পর্কেরই ইঙ্গিত দেয়। জঙ্গিদের বিরুদ্ধে আক্রমণে ভুটান ভারতকে সাহায্য করিতেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশও ভারতমুখী হইতেছে। এখন প্রয়োজন দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী জঙ্গিদের ধ্বংস করা। এই বিষয়ে প্রথম প্রয়োজন মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়া প্রত্যাঘাত এবং পশ্চিমবঙ্গে আশ্রিত জামাতি জঙ্গিদের ধ্বংস করা। রাজনীতি এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলি এইক্ষেত্রে বাধার পাঁচিল তুলিয়া দাঁড়াইলেও দেশের স্বার্থে মোদী সরকারের এই কার্যে এইবার অগ্রসর হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সরকার ইসলামি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লইতেছে। জামাতের সহযোগী দল বিএনপিও জামাতে জঙ্গিদের আপাতত মদত দেওয়া বন্ধ করিতেছে। সেই দেশের তাড়া খাইয়া বাংলাদেশের জঙ্গিরা এখন পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিন্তে আশ্রয় পাইতেছে। এই দেশে আসিয়া জামাতে জঙ্গিরা তৃণমূলী হইয়া এখানে ওখানে হিন্দুদের আক্রমণ করিতেছে। অতি সম্প্রতি সমুদ্রগড়, হাঁসখালি এবং সোনারপুরে এই হামলা হইয়াছে। মুসলমান ভোটের কাঙাল তৃণমূলদল নিশ্চুপ হইয়া ওই জঙ্গিদের মদত দিতেছে। কিন্তু তাহাদের মনে রাখিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশও নয়। সেদিন সুরাবর্দি প্রশাসন হাতে পাইয়াও পশ্চিমবঙ্গের ইসলামিকরণ করিতে পারেন নাই, আজ মুসলমান ভোটের লালসায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিকরণ করিতে পারিবেন না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের জনগণ মার খাইয়াও সেদিন প্রত্যাঘাত করিয়াছিলেন, আজও প্রত্যাঘাতের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

সুভাষিতম্

অগ্রতো চতুরো বেদাঃ পৃষ্ঠতো সশরো ধনুঃ।
ইদং শাস্ত্রং ইদং শস্ত্রং শাপাদপি শরাদপি।।

সামনে চারটি বেদ রয়েছে এবং পিঠে তির-ধনুক ধারণ করেছি। এই হলো শাস্ত্র এবং এটা হলো শস্ত্র। তোমাকে তির দিয়ে অথবা শাস্ত্র দিয়ে পরাজিত করব।

কোমি কাপুরের গ্রন্থে অপ্রকাশিত তথ্য

সিদ্ধার্থশঙ্করের পরামর্শে জরুরি অবস্থার নকশা তৈরি হয় ছ'মাস আগেই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোমি কাপুরের 'দ্য এমার্জেন্সি : আ পার্সোনাল হিস্টরি' গ্রন্থে উঠে এল ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার এযাবৎ

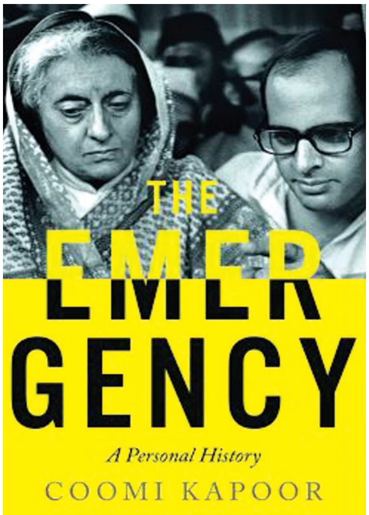

অপ্রকাশিত মারাত্মক তথ্য। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন। মূলত বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব-কে হাজতে পোরা এবং দেশের সাধারণ নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়াই ছিল এই জরুরি অবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এ রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যে ইন্দিরা গান্ধী-র এ ব্যাপারে মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন এ খবর আমাদের কমবেশি সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু কোমি কাপুর তাঁর গ্রন্থে ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ৮ জানুয়ারি ১৯৭৫ তারিখের একটি চিঠির উল্লেখ করেন। যাতে দেখা যায় ওই বছরের ২৫ জুন জরুরি অবস্থা জারির প্রায় মাস ছ'য়েক আগেই দেশে জরুরি অবস্থা জারির পরিকল্পনা পাকা হয়ে যায়।

তাঁর গ্রন্থে এই গোপন 'নোটে'র যে প্রতিলিপি ছেপেছেন কোমি তাতে দেখা যায় সিদ্ধার্থশঙ্কর লিখেছেন ইন্দিরাকে : 'একটি গোপন টেলি-বার্তা এই মুহূর্তে দেশের প্রত্যেক কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে হবে এই নির্দেশ দিয়ে যাতে তাঁরা তাঁদের রাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস) ও আনন্দমার্গের সক্রিয়, পরিচিত সদস্যদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এঁদের জরুরি

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

অবস্থা সংক্রান্ত কোনো অর্ডিন্যান্সের কথা এখনই বলার দরকার নেই। কিন্তু এই তালিকা তৈরি হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। একারণেই তৈরি হওয়া দরকার যাতে জরুরি অবস্থা জারির অব্যবহিত পরেই ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এবং পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই তালিকা তৈরি করতে হবে।' স্বাভাবিকভাবেই ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের কনট্রিবিউটিং এডিটর কোমি কাপুরের গ্রন্থে সিদ্ধার্থশঙ্করের এই বয়ান উঠে আসার পর দেশজুড়ে ফের কংগ্রেস-বিরোধী সমালোচনার ঝড় উঠেছে। স্পষ্টতই এই জরুরি অবস্থা জারি যে কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দেশের মানুষের কণ্ঠরোধ করবার একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত তা ফের প্রমাণিত হলো।

'নোটে' আরও লেখা হয়েছে : 'আমি আশাকরি দেশের রাষ্ট্রপতিকে অর্ডিন্যান্সে স্বাক্ষর করার জন্য সর্বদাই পাওয়া যাবে। একইসঙ্গে আগামীকাল সকালে কিংবা রাতে বা খুব দেরি হলেও অন্তত পরশু সকালের মধ্যেই বিশেষ ক্যাবিনেট বৈঠক ডাকা উচিত। অর্ডিন্যান্সের বিষয়টি তাহলে আগামী ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশি কিছু সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করে ফেলা যাবে।' কাপুর জরুরি অবস্থার সময় ছিলেন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাংবাদিক। এই সাংবাদিকতার সূত্রের জরুরি অবস্থার খুঁটিনাটি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরেছেন বই-তে। তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এইচ আর গোখলে, কংগ্রেস সভাপতি ডি কে বরুয়া এবং মুম্বই প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রজনী প্যাটেল— এই তিনজনের সঙ্গে বৈঠকের পরেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 'অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার পরিকল্পনা' করেন। কাপুরের বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম 'ডার্কনেস অ্যাট ডন'। বাংলা তর্জমায় দাঁড়ায় 'ঊষাকালে আঁধার'। বইতে সঙ্গতভাবেই তিনি অভিযোগ করেছেন যে, চিঠিতে লেখা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ীই জরুরি অবস্থা বাস্তবায়িত হয়েছে। শ্রীমতী কাপুর এও দেখিয়েছেন, 'সিদ্ধার্থশঙ্কর তাঁর 'নোটে' যে সময় জরুরি অবস্থা জারির পক্ষে সওয়াল করছেন তখন দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এমন কিছু অবনতি হয়নি যে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রসঙ্গত, জরুরি অবস্থা জারি হয় রায়বেরিলি থেকে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে দেবার ১০ দিন পর এবং সুপ্রিম কোর্ট সংসদে তাঁর ভোট দানের শর্তসাপেক্ষ স্থগিতাদেশ ঘোষণা করে ৩ দিন পর।■

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়করণের পক্ষে সওয়াল স্মৃতি ইরানির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৮ জুন হিন্দু এডুকেশন বোর্ডের অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে শিক্ষায় ভারতীয়করণের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি বলেন, আমরা পরম্পরাগতভাবে যে ক্ষমতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও গৌরবময় ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হয়েছি তা মোটেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং যা কিছু ভারতীয়, তার যথার্থ মূল্য দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, এমন শিক্ষানীতি হওয়া উচিত যা ভারতবর্ষকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে যে পদক্ষেপেই গ্রহণ করা হয় তাতেই নাকি 'গৈরিকীকরণ'-এর প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য বিমুখ সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের কাছে যে প্রাচীন গণিতশাস্ত্র রয়েছে তা পৃথিবী জুড়ে সমাদৃত হলেও, আমাদের দেশে 'গৈরিকতা' দোষে দুষ্ট। এছাড়াও ২১ জুন সরকারি উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে সমালোচনার যে ঝড় উঠেছে, তার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে ১৭৫টি দেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই দিনটি পালন করা নিয়ে আমাদের সমর্থন করছে, তারাও কি আমাদের মতো গৈরিক!"

স্মৃতি ইরানির সুর ধরেই শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তব্য রাখলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল। বর্তমানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে এদিনের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর সামনেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, সমস্ত শাখার জ্ঞানই অর্থহীন হয়ে পড়বে যতক্ষণ না তা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সংমিশ্রিত হচ্ছে। তাঁর মতে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের মূল ও আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া খুবই প্রয়োজন। আজ ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয়ত্ব, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুপস্থিতি। ভারতীয় মন আজ টালমাটাল এক বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একজন মানুষ পড়াশুনা শিখে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়, কিন্তু একটি ভালো মনের অধিকারী না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে এক শ্রেণীর ভারতীয় আছেন যাঁদের কাছে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় শাস্ত্র মূল্যহীন। কিন্তু এঁদের কাছে তা মূল্যহীন হলেও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নিরিখে যে তা অপাংক্তেয় নয় তা প্রমাণ করেছেন নিউ জার্সির প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক মঞ্জুল ভার্গব। তিনি বলেছেন, সংস্কৃত কবিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কের ধারণা গড়ে তুলতে। তাছাড়া যাঁরা এই বিষয়ে চর্চা করেন তাঁরা জানেন অঙ্কে এমন বহু সমস্যা আছে যেগুলি বৈদিক গণিতের সাহায্যে অতি সহজেই সমাধান করা যায়।

আসলে, ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয়রা শিক্ষায় 'গৈরিকীকরণ' নিয়ে উদ্বিগ্ন, তাঁরা হয়তো সুদীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনে অভ্যস্ত হয়ে হয় গৈরিক শব্দের অর্থটাই ভুলতে বসেছেন অথবা ভুলে যাওয়ার ভান করছেন। গৈরিক রঙ ত্যাগের প্রতীক, পবিত্রতার প্রতীক। ভারতের জাতীয় পতাকার শীর্ষেও এই গৈরিক রঙ রয়েছে। তাই শিক্ষায় যদি তথাকথিত গৈরিকিকরণ হয়ে থাকে তা অন্তত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে ভোগসর্বস্ব জীবনে নিমজ্জিত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের এক নতুন পথের দিশা দেখাবে। আর তাদের হাত ধরেই ভারতবর্ষে গড়ে উঠবে এক সুস্থ সমাজ জীবন যেখানে ভোগ নয় ত্যাগই হবে আদর্শ।

২০৫০ নাগাদ বিশ্ব অর্থনীতিতে কর্তৃত্বের রাশ হাতে রাখবে চীন ও ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন প্রকাশিত 'The World in 2050 : Quantifying the shift in the Global Economy' নামক প্রবন্ধে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্ব অর্থনীতিতে কোন মহা পরিবর্তন সাধিত হবে তা নিয়ে একটি বিশদ গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনে এশিয়ার দুই বিশাল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক বার্তা থাকলেও পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনো সুখবর এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী আগামী পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে অতি দ্রুত লয়ে চীন ও ভারতবর্ষ যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থানে উঠে আসবে। বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্র তখন উত্তর আটলান্টিক থেকে এশিয়ার মধ্যভাগে স্থানান্তরিত হবে। এই গবেষণাটি যদিও বিভিন্ন দেশের জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে ২০৫০ সাল নাগাদ চীন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশের পরিণত হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বিশ্বের জনবহুল দেশগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির মুখ দেখলেও বর্তমান ইউরোপীয় ধনী দেশগুলি (উদাহরণ স্বরূপ : সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড এবং সুইডেন) কম জনসংখ্যা, বার্ধক্যপীড়িত জনগণের কারণে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবথেকে বিস্ময়কর হলো, বিশ্ব অর্থনীতিতে কর্তৃত্বের রাশ হাতে রাখবে চীন ও ভারত।

পরিচ্ছন্নতার জন্য নিজেদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে : মোহন ভাগবত

আমরা নোংরা করব আর সরকার পরিষ্কার করবে— এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। উত্তরপ্রদেশের মথুরায় একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নিজেরা নোংরা করে সাফাই করার দায়িত্ব সরকারের দিকে ঠেলে দেওয়া অনুচিত। আগে আমরা ভগবানের উপর ভরসা করতাম, এখন সরকারের উপর ভরসা করতে শুরু করেছি। এই মানসিকতা ত্যাগ করে পরিচ্ছন্নতার জন্য নিজেদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন, ভগবান চাইলে রাবণকে এক মুহূর্তেই বিনাশ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে মানুষরূপে জন্ম নিয়ে যুদ্ধ করে রাবণকে বধ করেছেন। এর মাধ্যমে ভগবান নিজেই কাজ করতে হবে এই শিক্ষা দিয়েছেন।

সড়কপথে ভুটান, নেপাল, বাংলাদেশকে জুড়তে উদ্যোগ ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। স্থলপথে প্রতিবেশীদের জুড়তে এবার সচেষ্ট হলো ভারত। গত ১৫ জুন ভুটানে ভারতের সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরি তিনটি সার্ক-রাষ্ট্র ভুটান, বাংলাদেশ ও নেপালের সঙ্গে একটি চুক্তি সারলেন। যাতে বলা হয়েছে এই চারটি দেশে যাত্রী ও মাল-পরিবহণকারী যান অনায়াসে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। গত ১০ জুন ক্যাবিনেটে বিষয়টি অনুমোদিত হয়। ভারতের পাশাপাশি ভুটান, বাংলাদেশ ও নেপালের সড়ক পরিবহন মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে রাজধানী থিম্পুতে এই মোটর-ভেহিকল চুক্তি সম্পন্ন হয়। এছাড়াও ভারত, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডের সঙ্গেও যান চলাচলের কথা চলছে। গত ১৪ জুন ভুটান পৌঁছন গডকরি। ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরকারি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন এই চুক্তি নিরাপদ, অর্থনৈতিক ভাবে লাভদায়ক এবং পরিবেশ-বান্ধব সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে আদর্শ হবে। পাশাপাশি আঞ্চলিক সংহতির প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলের পক্ষেও এটি কার্যকরী হবে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, এই পারস্পরিক সীমা পেরিয়ে চলাচলের উপযোগিতা ভুটান, বাংলাদেশ ও নেপাল অবশ্যই অনুভব করতে পারবে। এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যাত্রী ও মাল-পরিবহনকারী যানের অপরিহার্যতার কথাও তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এই চার দেশের মানুষও এর ফলে অর্থনৈতিক ভাবে উপকৃত হবেন। এই চুক্তি-সম্পাদনের পর থেকে চারটি দেশই যান ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে তাদের আলাদা আলাদা খরচ বহন করবে বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, এবছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত, ভুটান, বাংলাদেশ ও নেপালের সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের সচিবদের এক বৈঠকে বিষয়টি আলোচিত হয় এবং এই চুক্তির একটি খসড়াও প্রস্তুত করা হয়। যেটি সামান্য কিছু পরিবর্তন বাদে সার্ক মোটর ভেহিকল চুক্তির অনুরূপ। ২০১৪-র নভেম্বরে কাঠমাণ্ডুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এই ধরনের চুক্তির পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল এদেশের ক্যাবিনেট এই প্রস্তাবকে অনুমোদন দেওয়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানের সক্রিয় বাধার জন্য চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হতে পারেনি। এধরনের চুক্তি এই চার-দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও লাভদায়ক হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বিশেষ করে বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানের এবং নেপাল, ভুটানের ওপর চীন প্রভাব বিস্তারের যে লাগাতার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ভারতের এই উদ্যোগে তাতে আংশিক ছেদ পড়বে বলেই কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা

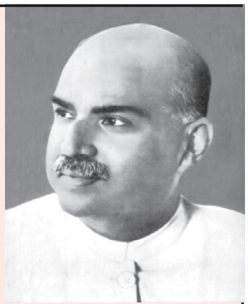

প্রকাশিত হবে ৬ জুলাই, ২০১৫

ভারত তথা বাংলায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান আজও প্রাসঙ্গিক। দেশ বিভাগের ক্ষত এখনও শুকায়নি, হিন্দু শরণার্থীদের একাংশ এখনও এদেশে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারেনি, কাশ্মীর আজও গলার কাঁটা। এইসব প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েই এবারের শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা। লিখেছেন অনির্বান গাঙ্গুলী, নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ।

সত্বর কপি বুক করুন, অন্যথায় অতিরিক্ত কপি পাওয়া যাবে না।।। মূল্য : ১০ টাকা।।

রেল পরিষেবা উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের সদর্থক ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় রেল বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম 'নেটওয়ার্ক' এবং পরিষেবার জন্য পরিচিত ও বিখ্যাত হলেও পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির রেল পরিষেবার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণ সেই অর্থে এখনও সংস্কারপ্রাপ্ত হয়নি। কেন্দ্রে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সেই সরকারের কাছে যাত্রীকুলের আবেদন থাকে উন্নত রেল পরিষেবা, যাত্রী সুরক্ষা এবং আধুনিকীকরণের মতো বিষয়গুলি। বিগত বছরগুলিতে দেখা গেছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে রেল পরিষেবা তলানিতে এসে ঠেকেছে। বিভিন্ন দল যখনই রাজধানীর তখতে বসেছে, তখনই ভোটকে লক্ষ্য রেখে কেবলমাত্র বিভিন্ন জনমোহিনী ঘোষণা করে গেছে। ফলে রেলকে লাভের মুখ দেখিয়ে, তার আধুনিকীকরণ বা সংস্কার তাদের 'প্রায়োরিটি'-এর তালিকায় বরাবরই ব্রাত্য থেকে গেছে। যার ফলে রেল পরিষেবার ভবিষ্যৎ নিয়ে এই মোদী সরকারের আমলেও বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে রেল পরিষেবার আধুনিকীকরণ করেও তাকে কী উপায়ে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা যায়।

বিগত ১৫ বছরে অন্তত ১০টি কমিটি রেলের সংস্কারের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করলেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে কোনো সুপারিশই কার্যকর করা হয়নি। যাত্রীসুরক্ষা রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও তা বরাবরই উপেক্ষিত থেকে গেছে। এমনকী রেল বগি লাইনচ্যুত হওয়া, ট্রেন সংঘর্ষ, আগুন লাগার মতো গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রায়শই ঘটা এই প্রকার দুর্ঘটনা রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার মতো অর্থও রেলমন্ত্রকের কাছে নেই। এমতাবস্থায় রেলের এই নেতিবাচক দিকগুলো খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে বিবেক দেবরায় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটি বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে প্রধানত তিনটি সুপারিশ করেছে। প্রথমত, রেল মন্ত্রকের আলাদা বাজেট তুলে দিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলির বৃহত্তম ভূমিকা গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, রেলওয়ে রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া নামক একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৈরি এবং তৃতীয়ত, রেল প্রশাসন সহজতর করতে রেলওয়েকে ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত করা। রেলপরিষেবার সঙ্গে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে যুক্ত করা নিয়ে যদিও এর মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে বেসরকারি সংস্থাগুলি যুক্ত হলে রেল পরিষেবার যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে। এছাড়াও রেলের যে মূল কাজ অর্থাৎ যাত্রীবাহী ট্রেন ও মালগাড়ি চালানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে শুরু করে কোচ ও লোকোমোটিভ তৈরি, খাদ্য সরবরাহ পরিষেবা, স্কুল ও হাসপাতাল চালানোর মতো গুরুদায়িত্বগুলির পৃথকীকরণ প্রয়োজন। এর ফলে প্রশাসনিক দক্ষতা ও আর্থিক সমৃদ্ধি দু'টোর গতিই ঊর্ধ্বমুখী হবে। এই সকল সুপারিশের পাশাপাশি দেবরায় কমিটির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো রেল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত থেকে রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রাখা।

আসমুদ্র হিমাচল ১,১৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারতীয় রেলপথ পরিষেবাকে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত করার যে সুপারিশ দেবরায় কমিটি করেছে তা অত্যন্ত বাস্তবানুগ এবং নরেন্দ্র মোদীর ছোট কিন্তু দক্ষ সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরপর দেখা যাক নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সুরেশ প্রভুর রেলমন্ত্রক সংস্কারের পথে হেঁটে রেল পরিষেবাকে কতটা মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে যাত্রী সাধারণকে আধুনিক রেল পরিষেবা দিতে পারে।

১৯৩টি দেশের যোগশিক্ষায় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর চেষ্টাতেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ জুন তারিখকে আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে। তাই সারা দেশে এই দিনটিতে যেমন যোগদিবস উদযাপন হবে তেমনই ১৯৩টি দেশে যোগশিক্ষা দেবে ভারত। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেন, প্রথম আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদযাপনে ভারতকে যদি কোনো দেশ তা করতে অনুমোদন না দেয় তাহলে সেদেশের ভারতীয় দূতাবাস, কনসুলেটে যোগদিবস উদ্‌যাপিত হবে। একমাত্র যোগানুশীলনের মাধ্যমেই শরীর ও মনের শান্তি সম্ভব। যা প্রাচীনকাল থেকে মুনি ঋষিদের দ্বারা হয়ে আসছে। তবে যোগশিক্ষা যে শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের এমনটা তা নয়। একথাকে এতদিন ভুল প্রচার করা হয়েছে বলে বিদেশমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, যোগশিক্ষা বন্ধের লক্ষ্যে এসব করা হোত, এটা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের নয়। এই শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে লাভবান হতে পারে যে কোনো ধর্মের মানুষ। ২১ জুন রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রথম আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদযাপন হবে নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে। যার সভাপতি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক যোগদিবসের লোগো প্রকাশ করেন বিদেশমন্ত্রী।

পাকিস্তানের ভয় ভারত একইভাবে অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে পারে

গূঢ় পুরুষের কলম

চলতি জুন মাসে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আন্তর্জাতিক কট্টর জেহাদি সংগঠন ইসলামিক স্টেট বা আই এস প্রকাশ্যে ভারত বিরোধী মিছিল করেছে। এই মুহূর্তে আই এস বিশ্বের সর্বাধিক হিংস্র মানবতা বিরোধী জঙ্গি সংগঠন। ওসামাবিন লাদেনের মৃত্যুর পর তার আল কায়দা সংগঠনের শক্তি হ্রাস পায়। আল কায়দার রক্তলোলুপ সুন্নি মুসলমান জঙ্গিরা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া। পরে নাম সংক্ষিপ্ত করে পরিচিত হয় ইসলামিক স্টেট নামে। এই নিষ্ঠুর জঙ্গি সংগঠনের লক্ষ্য সমগ্র বিশ্বকে ইসলাম করা। সিরিয়া এবং ইরাকে আই এস জঙ্গিরা তীব্র লড়াই চালাচ্ছে। এদের লড়াই যদিও শিয়া মুসলমান এবং কুর্দদের বিরুদ্ধে তবুও এর বাইরে সুন্নি মুসলমান নয় এমন সব মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ করে তারা সন্ত্রাস ও আতঙ্কের বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। নিষ্ঠুরতায় আই এস জঙ্গিদের জুড়ি পাওয়া যাবে না। পাকিস্তান আই এস জঙ্গি নেতাদের কাশ্মীরে সংগঠন গড়তে এবং জেহাদি তৎপরতা বাড়াতে সবরকম সাহায্য করছে। আমেরিকার দেওয়া সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তান এদের হাতে তুলে দিয়েছে। পাক সেনাপ্রধান রাহিল শরিফ ঘোষণা করেছেন যে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তান যে কোনো মূল্য চোকাতে প্রস্তুত। অর্থাৎ প্রয়োজনে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য পাকিস্তান আই এস-কে পরমাণু অস্ত্রও দিতে দ্বিধা বোধ করবে না।

পাকিস্তানের উষ্মার কারণ সম্প্রতি মায়ানমারের জঙ্গলে নাগা জঙ্গিদের গোপন ঘাঁটি ভারতীয় সেনা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের ভয় ভারত যদি একইভাবে অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিদের ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয় তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মুখ পুড়বে। পাক সেনাপ্রধান রাহিল শরিফ প্রকাশ্যে বলেছেন যে ভারত শত্রুরাষ্ট্র। শরিফের অভিযোগ, ভারত কাশ্মীর সীমান্তে যুদ্ধবিরতি একতরফাভাবে লঙ্ঘন করছে এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে মদত দিচ্ছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে প্রয়োজনে পাকিস্তান ভারতকে শায়েস্তা করতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করবে না। আন্তর্জাতিক মহলের ধারণা, পাক সামরিক বাহিনী সরাসরি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করে আই এস জঙ্গিদের হাতে এই অস্ত্র তুলে দিতে পারে। যাতে অপরাধের দায় হিংস্র উন্মাদ এই জঙ্গি সংগঠনের উপর পড়ে।

পাক সেনাপ্রধানের ভারত বিরোধী হুমকিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের ভিতর দিয়ে চীন ও পাকিস্তানকে জুড়ে সম্প্রতি যে ইকোনমিক করিডর তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে তা' নিয়ে ভারত তীব্র আপত্তি জানিয়েছে। পারভেজ মুশারফ বলেছেন, 'আমাদের শত্রুদের কথায় আমরা গুরুত্ব দি' না। শত্রু শক্তির পক্ষে এই প্রকল্প নিয়ে মিথ্যা রটনা সম্পর্কে পাকিস্তান খুব ভালভাবে অবগত আছে। এর কড়া জবাবই দেবে পাকিস্তান।' প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। পাক সেনা প্রধান এবং প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট যদি প্রকাশ্যে ভারতকে শত্রু রাষ্ট্র বলতে পারেন তবে ভারতেরও উচিত পাকিস্তানকে শত্রু রাষ্ট্র ঘোষণা করা। ভারতের শাসকদের পাক ভীতি এবং নপুংসকতা আমাদের মাথা হেঁট করে দিচ্ছে। আমরা ভুলে গেছি যে কার্গিল সহ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মোট তিনটি যুদ্ধে ভারত জয়ী হয়েছিল। পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে ছারপোকার মতো টিপে মারার ক্ষমতা আছে ভারতের। তবু আমাদের ভয় যায় না। ১৯৬৫ সালে ভারতীয় সেনা লাহোর দখল করেও ফিরে আসে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ পাক সেনাকে বন্দি করেও পরে সসম্মানে পাকিস্তানে ফেরত পাঠান প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী। ভারত সব সময় মনে করে পাকিস্তান ভারতের বন্ধুরাষ্ট্র। তিনটি যুদ্ধের পরেও এই ধারণা ভারতীয় শাসকদের পাল্টায়নি। অথচ বাস্তব অন্য কথা বলে। পাক রাজনীতিক মূল কথাটাই হচ্ছে ভারত বিদ্বেষ। কারণ, হিন্দু বিদ্বেষ থেকেই পাকিস্তানের জন্ম। একথা জেনেও ভারতীয় শাসকরা পাকিস্তানকে বন্ধু মনে করেন। যদি ভারত পাকিস্তানকে শত্রু রাষ্ট্র রূপে চিহ্নিত করতো তবে ইঁটের জবাব পাথরে দেওয়া যেত। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

'কুল' থাকুন রাজা রামমোহন

মাননীয় রাজা রামমোহন রায়

প্রাক্তন বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

পরিচয় দেখে রাগ করবেন না। আপনি মানুন না মানুন, ইতিহাস মানুক না মানুক, আপনি আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন বিধায়ক। আপনি রাজ্য বিধানসভায় ছিলেন। কারণ আমাদের প্রিয় দিদি, মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা কক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ''ভুলে গেলে চলবে না, সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইনও সবার আগে পাশ করেছিল এই বিধানসভা।'' কদিন আগের এই বয়ানই প্রথম নয়, এর আগেও নানা সময় নিজের মতো করে ইতিহাসের অনেক 'ঐতিহাসিক তথ্য' উপহার দিয়েছেন দিদি। ইতিহাস বইতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও যার হদিস মিলবে না, কিন্তু তার প্রতিটি বর্ণ সত্য। ধর্মতলায় (সিদো-কানহু-ডহরে) সমাবেশে সিদো-কানহুর সঙ্গে ডহরবাবুর পরিবারেরও খোঁজ করেছেন তিনি। কখনও নয়া ইতিহাসের পাঠ দিয়ে দাবি করেছেন, ফলের রস খাইয়ে গান্ধীজীর অনশন ভেঙেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সবাই মুখ বুজে শুনেছে, চোখ, কান লাল হয়েছে, তবু মুখে কথা সরেনি। সুতরাং রাজা রামমোহন রায় আপনিও রাগ করবেন না। এটাই আপনার নতুন পরিচয়। এরপর আপনার রাজবাড়ির খোঁজ করে তা হেরিটেজ ঘোষণার নির্দেশ দিতে পারেন তিনি, পর্যটনের নতুন ঠিকানা বানাতে পারেন। এমনকী রানিমা, রাজপুত্র, রাজকন্যাদের খোঁজ শুরু হতে পারে। সব মেনে নিতে হবে। মেনে নিন। এর আগে গত ৫ জুন বিধানসভার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের অনুষ্ঠানেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই বিধানসভায় আমরা তার ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান পালন করছি। মনে রাখতে হবে, রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা বিলোপের মতো আইনও এই বিধানসভাতেই প্রথম পাশ হয়েছিল।'' যদিও আমার জ্ঞান বলছে, আপনার মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ১৮২ বছর আগে! তখন রাজ্য বিধানসভার অস্তিত্ব ছিল না। আর তখন ছিল কোম্পানি আমল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর নির্দেশে ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ নিবারণী আইন জারি হল। অবশ্যই রামমোহন রায় ছিলেন নেপথ্যের অন্যতম কারিগর। তবু আমি দিদির কথাই বিশ্বাস করি। তাঁর কথাকেই সঠিক বলে মনে করি। বেদবাক্য বলে মনে করি।

১৮৬১ সালে রানী ভিক্টোরিয়া গোটা দেশের জন্য সতীদাহ প্রথা রদ আইন জারি করেন। ১৯৩৬-এ যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হয়েছিল, তা যে এখনকার বিধানসভা নয় তা আমি জানি। আর স্বাধীনতার পর দেশের সংবিধান মেনে বিধানসভা হয়েছে ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে। এসব জানি, তবু আমি দিদির কথাই মানি। তাঁর কথাকেই বেদবাক্য মনে করি।

মাননীয় রাজা রামমোহন রায়, এসব ইতিহাস শুনে কিছু মনে করবেন না প্লিজ। অতীতে গান্ধীজির অনশন ভাঙানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বা মোহনদাস কেউই প্রতিবাদ করেননি। শেক্সপিয়র আর রবীন্দ্রনাথ শত শত বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে লন্ডনে সাহিত্য আলোচনা করেছেন।

আসলে মনে রাখবেন, আপনাদের সকলের মতো তিনিও মহাপুরুষ। মহানারী বলে ছোট করবেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণের আছে কথামৃত। রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি। দুইয়ে মিলে দিদির কথা+অঞ্জলি= কথাঞ্জলি।

সেই বই এখন রাজ্যের সেরা পড়ুয়াদের নিয়মিত পাঠ্য। দিদি নিজে হাতে ওদের দিয়ে বলেছেন, এগুলো পড়লে তবেই তোমরা মানুষ হতে পারবে। আমিও সে বই একখানি কিনে ফেলেছি। দিদির সেইসব অমৃতবাণী-র কয়েকটি তুলে ধরেছি। দেখবেন তিনি কীভাবে বঙ্গবাসীর যাবতীয় ক্লান্তি, কষ্ট সব নিমেষে সাফ করে দেওয়ার জন্য কেমন কলম ধরেছেন। সেই সব বাণীর অর্থ বের করার কষ্ট না করলেই সবাই সুস্থ থাকবে। নির্মল হাসি লাফিং ক্লাবে যাওয়ার সময়ও বাঁচিয়ে দেবে। রাজা রামমোহন রায়, দিদির ভাষাতেই বলি আপনিও এসব দেখেশুনে 'কুল' থাকুন।

দিদি উবাচ

জীবন-জীবনী-জীবন গ্রন্থে জীবন জীবনাঞ্জলি শতক চলে, আবার আসে নূতন শতাঞ্জলি!

উন্নত চরিত্র, সভ্যতার সা-রে-গা-মা-পা

হতাশ হতেই নেই, লোভ করতে নেই, অহঙ্কার ভাল নয়, স্বাস্থ্যই সম্পদ, 'কুল' থাকো নেভার মাইন্ড ফর ব্যাকবাইটিং।

সব রোগের ওষুধ আহিষ্কার হলেও হিংসা রোগের কোনো ওষুধ নেই।

যখন সব সেট হয়ে গেছে, তখন আর আপসেট হয়ো না।

এনভায়রনমেন্ট পলিউশন
থেকেও মেন্টাল পলিউশন বেশি
ক্ষতি করে।

মনুষ্যত্বের নামে মানুষ,
ঔদ্ধত্যের নামে ফানুস।

— **সুন্দর মৌলিক**

অসুরক্ষিত সীমা ও তিক্ততার বীজ অক্ষত রেখেই কার্যকর হতে যাচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমা চুক্তি

সাধন কুমার পাল

গত ৬ জুন শনিবার বিকেলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা কক্ষে ভারতের বিদেশ সচিব সুব্রহ্মনিয়ম জয়শঙ্কর ও বাংলাদেশের বিদেশ সচিব শহিদুল হক স্থলসীমা বিনিময় চুক্তির ঐতিহাসিক দলিল হস্তান্তর করলেন। ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ৪১ বছর পর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তটিতে পৌঁছানোর জন্য গত ৪১ বছর ধরে কংগ্রেসী সরকারগুলি বহু চেষ্টা করেও সফল হয়নি। বিরোধী দলগুলিকে বাগে এনে নিজের দেশের মাটি অন্য দেশকে হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনের জন্য নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারকেও কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। সে দিক থেকে দেখলে স্থলসীমা চুক্তি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদীর এবারের ঢাকা সফর ঐতিহাসিক।

এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত এই সফর সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তাতে এটা স্পষ্ট যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে ইন্দিরা- সোনিয়া-মনমোহনের পদচিহ্নে পা রেখেই এই ঐতিহাসিক ঢাকা সফর সম্পন্ন করতে হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সঙ্গেও নেহেরু-নুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। জনসঙ্ঘের নেতৃত্বেই সে সময় বেরুবাড়ি হস্তান্তর-বিরোধী প্রবল জনআন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। দলমত নির্বিশেষে সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ। সেদিন দেশপ্রেমিক মানুষ শপথ নিয়েছিল 'রক্ত দেবো প্রাণ দেব, বেরুবাড়ি দেবো না।' ফলে সে সময় সংবিধান সংশোধন (নবম সংবিধান সংশোধন) করেও নেহেরু সরকার পাকিস্তানকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য, স্বাধীন ভারতের নয়, বেঙ্গল বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিফ সাহেবের ভুলের জন্যই তৈরি হয়েছিল বেরুবাড়ি বিতর্ক। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের ভুলের খেসারত হিসেবে নেহেরু-নুন চুক্তিতে পাকিস্তানকে বেরুবাড়ি উপঢৌকন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর সেই ভুলের জের টেনে এনে ভারতের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক আরেকটি ভুল করা হলো। বেরুবাড়ির বদলে তিনবিঘা করিডরের মাধ্যমে আঙ্গারপোতা, দহগ্রাম ছিটমহল দুটিকে বাংলাদেশের মুল ভুখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৭৪-এ স্বাক্ষরিত হলো ইন্দিরা-মুজিব স্থলসীমা চুক্তি। নেহেরু-নুন চুক্তির মতো এই চুক্তিতেও উল্লেখ করা হলো ছিট বিনিময়ের ফলে ভারতের যে বাড়তি (দশ হাজার একর) জমি যাবে তার জন্য বাংলাদেশের কাছে কোনও ক্ষতিপূরণ দাবি করা হবে না। ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষর হওয়ার পর এই ইন্দিরা-মুজিব স্থলসীমা চুক্তির বিরোধিতা করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রেরণায় জাতীয়তাবাদী মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে গঠিত হয় কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি। ১৯৭৭-এর আশেপাশে কোনও এক সময় জনতা পার্টির নেতা হরিপদ ভারতী, ১৯৮১ সালে বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, ১৯৮২ সালে বিজেপির সংসদ সদস্য গুজরাটের এ কে প্যাটেল, কৈলাসপতি মিশ্র প্রমুখ সংগ্রাম কমিটিকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য কুচলিবাড়িতে এসেছিলেন। ১৯৮১ সালে ভারতভূখণ্ড ব্যবহার করে আঙ্গারপোতা, দহগ্রামগামী বাংলাদেশের জনগণনাকারী দলকে বাধা দেওয়ার জন্য কুচলিবাড়ি সংগ্রাম কমিটি সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে সময় সঙ্ঘের দুজন প্রবীণ প্রচারক স্বর্গীয় দেবব্রত সিংহ ও স্বর্গীয় মনমোহন রায় সেই আন্দোলনের নেতৃত্বভার কাঁধে তুলে নেন। আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিজেপি সাংসদ গুমনমল লোধা ও কৈলাশপতি মিশ্র কুচলিবাড়িতে এসেছিলেন। ইতিমধ্যেই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এই আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে ১৯৯২-এর ২৩ জুন বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি মুরলীমনোহর যোশী, ২৫ জুন লোকসভার বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানী, ১৩ জুন বর্তমান বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ কুচলিবাড়িতে এসেছিলেন। লালকৃষ্ণ আদবানী ও বর্তমান বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ দুজনেই কুচলিবাড়িতে আয়োজিত এক জনসভায় বলেছিলেন— এখন আমরা এই হস্তান্তর রুখতে না পারলেও সুযোগ পেলেই ভবিষ্যতে বিজেপি এই চুক্তি সংশোধন করবে। স্থানীয় একটি দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেও তিনবিঘা সংক্রান্ত একটি অ্যাকশন কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৯২-এর ২৬ জুন এই হস্তান্তর রুখে দিতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের আহ্বানে বিহার উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দেশপ্রেমিক পড়ুয়াদের কুচলিবাড়িতে পৌঁছে, আবার অনেকে কুচলিবাড়িতে পৌঁছনোর আগেই হলদিবাড়ি, ময়নাগুড়ি, ভোটপট্টির মতো বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ

ও সিপিএমের ক্যাডারদের হাতে অকথ্য অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেদিন পুলিশের গুলিতে দুজন স্থানীয় বাসিন্দা জিতেন রায় ও ক্ষিতেন অধিকারী শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। নির্মিত হয় শহিদবেদী। বিগত ২৩ বছর ধরে কুচলিবাড়িতে মর্যাদা সহকারে শহিদ দিবস পালিত হয়ে আসছে। সঙ্ঘ ও বিজেপির এমন সর্বভারতীয় কার্যকর্তা কমই আছেন যাঁরা বিভিন্ন সময়ে এই শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেননি।

বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছেই এটা কৌতূহল হতে পারে যে, স্থলসীমা চুক্তির আরও অনেক বিষয় আছে (যেমন ছিট বিনিময়োত্তর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ দশ হাজার একর জমির বেশি পাচ্ছে) সে সব ছেড়ে সঙ্ঘ ঘরানার সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলি কেন শুধু তিনবিঘা নিয়েই আন্দোলন করছে। এই প্রশ্নের একটিই উত্তর তা হলো জাতীয় নিরাপত্তা। তিনবিঘা করিডরের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ভারতের পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়া বাংলাদেশি ছিট আঙ্গারপোতা দহগ্রামের অবস্থান এমনই যে এখান থেকে রিভলবার দিয়ে গুলি ছুড়লে মেখলিগঞ্জ মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে নিশানা বিদ্ধ করা যাবে। তথ্য ও স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা বলছে, করিডর পাওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের এই ছিট ভূখণ্ড অনুপ্রবেশকারী, চোরাকারবারি ও ভারত বিরোধী জেহাদি শক্তির গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে খালেদা জিয়া ও জামায়েতের মতো ভারতবিরোধী শক্তির মদতে তিস্তা নদীর পারে অবস্থিত এই ছিটমহলে আইএসআইএসের মতো সন্ত্রাসবাদী শক্তির ডেরা হয়ে উঠবে না তা কে বলতে পারে। তিনবিঘা করিডরের জন্য ১৫২৯১ একর আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশ ঘেরা কুচলিবাড়ি এলাকা এক ছিটমহলে পরিণত হয়েছে। ফলে সুযোগ সামর্থ্য হলেই এখান থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা সরে যাচ্ছে। ১৯৮১-এর সেনসাসে কুচলিবাড়ি জনসংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। ২০১১-এর সেনসাসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩৪৫৬ জন। কাগজে কলমে না হলেও ভবিষ্যতে যে এই এলাকা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দখলে চলে যাবে এই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সঙ্গত কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্থানীয় ও সঙ্ঘ ঘরানার মানুষের মনে এই প্রত্যাশা জেগে উঠেছে যে, এই সরকার ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দশ হাজার একর অতিরিক্ত জমি কাগজে কলমে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার আগে কমপক্ষে সাড়ে চার হাজার একর আয়তন বিশিষ্ট আঙ্গারপোতা দহগ্রাম ছিটমহল ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য নতুন করে কোনও বোঝাপড়ার প্রয়াস চালাবে। তবে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলেও এখনো মানুষ বিশ্বাস করে বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে বর্তমানে তৈরি হওয়া সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বর্তমান সরকার তিনবিঘা করিডরের বিলোপ সাধন ও আঙ্গারপোতা দহগ্রাম ছিটমহল ভারতে যুক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। বর্তমান সরকারকে এটা করতেই হবে না, হলে আগামী দিনে প্রশ্ন উঠবে কংগ্রেস-মুক্ত ভারত গঠনের কথা বলে ক্ষমতায় এসে বর্তমান

আঙ্গারপোতা দহগ্রাম

"বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডের পর এটা প্রমাণিত যে বাংলাদেশের ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ভারত নয়, কিছু ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করছে। সেজন্য আঙ্গারপোতা দহগ্রামের মতো ছিট ভূখণ্ড ভারতের জন্য যতটা বিপজ্জনক ঠিক ততটাই বিপজ্জনক বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য।"

প্রধানমন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমাচুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে নিজস্ব পদচিহ্ন তৈরি না করে সেই কংগ্রেসের পদচিহ্নই অনুসরণ করছে কেন?

বলা হচ্ছে, ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমা চুক্তি রূপায়ণের ফলে দু-দেশের সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। এই নতুন অধ্যায় কতদিন পাঠক্রমে চালু থাকবে সে প্রশ্নও কিন্তু উঠছে। কারণ বাংলাদেশের জন্মের জন্য ভারতীয় সেনারা নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দু-দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল তা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তিনবিঘা করিডর প্রথমে একঘণ্টা অন্তর অন্তর, পরে টানা বারো ঘণ্টার জন্য, শেষে ২৪ ঘণ্টার জন্য খুলে দিয়ে দু-দেশের মধ্যে যে সুসম্পর্কের অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল তাও কিন্তু খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়েছে এমন দাবি বোধহয় কেউ করবেন না। উন্নয়ন, কানেকটিভিটি, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ, চীনা আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো ও শেখ হাসিনার মতো প্রগতিশীল শাসকের সে দেশের শাসন ক্ষমতায় টিকে থাকার মতো অনুকূল অবস্থা তৈরি করা যতটা জরুরি ঠিক ততটাই জরুরি দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করতে পারে এমন জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করা ও যথা সম্ভব অপসারিত করা। যেমন, বাংলাদেশ তিস্তা ও ফেনী নদীর জলবণ্টনের কথা বলছে, সেইসঙ্গে পুনর্ভবা ও আত্রেয়ী নদীর জলবণ্টন নিয়ে ভারতের মানুষের দাবিটিও ভেবে দেখতে হবে।

স্থলসীমাচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও দু-দেশের সীমান্তের এমন কিছু সমস্যা আছে যেগুলি থেকে যে-কোনও মুহূর্তে দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক বিষিয়ে উঠতে পারে। বর্ধমানের খাগড়াগড় কাণ্ডের পর এটা প্রমাণিত যে বাংলাদেশের ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ভারত নয়, কিছু ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করছে। সেজন্য আঙ্গারপোতা দহগ্রামের মতো ছিট ভূখণ্ড ভারতের জন্য যতটা বিপজ্জনক ঠিক ততটাই বিপজ্জনক বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য। কারণ বাংলাদেশ প্রশাসনের পক্ষে তিনবিঘা করিডর দিয়ে যুক্ত এই ভূখণ্ডকে পূর্ণ নজরে রাখার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে এই পশ্চিমবঙ্গেই পাঁচশোর মতো গ্রামে লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। এই মানুষগুলির জীবন জীবিকা ও নিরাপত্তার কোনও গ্যারান্টি নেই। এরা পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। অনেক জায়গাতেই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা জোর করে এদের জমি ভাগচাষ করছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের দয়ায় এদের বেঁচে থাকতে হয়। নো-ম্যানস ল্যান্ডের এই গ্রামে দেড়শো গজের নিয়ম রক্ষার মতো বাংলাদেশের আপত্তির জন্য অনেক জায়গাতেই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনুপ্রবেশ, জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের যাতায়াত, গোরুপাচার, চোরাকারবার, মাদকপাচার, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হচ্ছে না। বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাওয়ার পর এসব নিয়ন্ত্রণ করতে বি এস এস-কে গুলি চালাতে হচ্ছে। বাংলাদেশ বরাবর বিএসএফের গুলিতে এই মৃত্যুগুলিকে সীমান্ত হত্যা বলে আখ্যায়িত করে। এইসব নিয়ে মাঝে মাঝেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম হয়ে ওঠে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা তৈরি হয়। পাশাপাশি এই সমস্ত সীমান্ত অপরাধ নিয়ে অসন্তোষ দানা বাঁধছে ভারতীয় জনমানসে। দু'দেশের সম্পর্কের তিক্ততা তৈরির এটি একটি বড়ো জায়গা। একটু পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে, সীমান্তের এই সমস্যাগুলির জন্য দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েও তা বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় ভারত-বাংলাদেশ জিরো লাইন বরাবর যৌথভাবে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করে তাতে যাতায়াতের গেটের সংখ্যা কমিয়ে উভয় দেশ নিজ নিজ দিকে বেড়া পাহারা দিয়ে স্থলসীমান্ত সুরক্ষিত করুক।

ছিটমহলের বাসিন্দাদের পুনর্বাসন ও নাগরিকত্বের বিষয়টিও ভারতীয় জনমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। ১৯৯২-এর ২৬ জুন তিনবিঘা করিডর চালু হওয়ার পর আঙ্গারপোতা দহগ্রামের হিন্দু বাসিন্দাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে লুটপাট করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরা এখন মেখলিগঞ্জ এলাকায় বসবাস করছে। এই মানুষগুলি নানাভাবে ভারতের নাগরিকত্ব হাসিল করলেও উপযুক্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে বর্তমান পুনর্বাসনের আওতায় আনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের কোটি কোটি হিন্দু বাসিন্দার মতো ওই দেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ছিটমহলগুলি থেকে বিভিন্ন সময়ে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে প্রকাশ্য জনশুনানির মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই মানুষগুলিকে চিহ্নিত করে উপযুক্ত নথি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বর্তমান পুনর্বাসনের আওতায় আনা প্রয়োজন। ছিট বিনিময়ের সুযোগে বাংলাদেশিদের অবৈধভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের প্রশ্নটি রোধ করতে হলে ২০১১-এর জনগণনা নয়, ১৯৭১-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে নিয়ে উপযুক্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখে ছিটমহলের বাসিন্দা চিহ্নিত করে তবেই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি ভাবা দরকার।

সব মিলে বলা যায়, আবেগ সরিয়ে রেখে মোদী সরকার যদি বাংলাদেশের সঙ্গে বোঝাপড়া এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, যাতে (১) আঙ্গারপোতা দহগ্রামের মতো ছিট ভূখণ্ড ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা, (২) জিরো লাইন বরাবর কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ ও যৌথপ্রহরার ব্যবস্থা করা, (৩) দু'দেশের বৈধ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বাড়ানো, (৪) শুধু দু'দেশের মধ্যে নয়, নেপাল, ভুটানের মতো দেশগুলির সঙ্গেও কানেকটিভিটি ও ট্রানজিটের সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখে তা কার্যকর করতে পারে তাহলে বর্তমানে যে সুসম্পর্কের অধ্যায়ের সূচনা হলো তা দীর্ঘস্থায়ী হবে এমন যুক্তিগ্রাহ্য ভবিষ্যতের কল্পনা করা যেতেই পারে। ■

দেশের মানুষের ভালোবাসা জয় করে দিল্লি ফিরেছেন মোদী

ঢাকা থেকে বাসুদেব ধর॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ সফরে এসে মানুষের হৃদয় জয় করে দিল্লি ফিরেছেন। দু'দিনের সফর শেষে ফেরার অব্যবহিত আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত জনবক্তৃতায় বাংলায় বললেন, ‘‘আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা তোমাদের নিয়ে চলব।" ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া ভারতের আর কোনও প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে বলেননি। বাংলাদেশের মানুষের আস্থার জায়গাটা তৈরি করেছিলেন আগেই, সফরে আরও কাছাকাছি এলেন। সফলের প্রাপ্তি কি? মোদী নিজেই জবাব দিয়েছেন, ‘‘আমার এই সফর শুধু এশিয়ার নয়, সারা বিশ্বেই ময়নাতদন্ত হবে। কেউ হয়তো মাপকাঠি নিয়ে তা খতিয়ে দেখবে। আমি বিশ্ববাসীকে বলতে চাই, লোকেরা মনে করতো আমরা খুব আশেপাশে রয়েছি, এখন বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করতে হবে, আমরা একসঙ্গে রয়েছি।" নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করে দেন, ‘‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আমার চিন্তা-ভাবনা এক ও অভিন্ন—তা হলো উন্নতি, উন্নতি আর উন্নতি। দু-দেশ একসঙ্গেই সামনের দিকে চলব।"

দুই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা শেষে ‘নতুন প্রজন্ম নতুন দিশা' শিরোনামে যৌথ ঘোষণায় বলা হয়েছে, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও সংযোগ জোরদারের মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন যুগের সূচনা করতে চায় বাংলাদেশ ও ভারত। নরেন্দ্র মোদী ও শেখ হাসিনা নতুন যুগেরই সূচনা করেছেন। বাংলাদেশের গণমাধ্যম সীমন্ত চুক্তি ভারতের পার্লামেন্টে অনুমোদন করে সংবিধান সংশোধনকে বলেছেন, বার্লিনের দেয়াল ভাঙা। এই সফরে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল তিস্তা নিয়ে। হবে না, জানাই ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ আগেই দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন। কিন্তু মোদীর সফর

ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন মোদী।

শেষে দেখা যাচ্ছে, তিস্তার ব্যর্থতার দায়ে আঙুল উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। মোদীর দিকে নয়। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি মোদীর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা সবাইকে স্পর্শ করেছে। মমতার অনমনীয়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করছে, মোদী পারবেন। যেভাবে সবাইকে এক করে সীমান্ত চুক্তির ‘দেয়াল' ভেঙেছেন। মোদীও আশ্বস্ত করেছেন—তিস্তার জন্যে একটু সময় চাই। মোদী এমন এক মজবুত সেতু তৈরি করেছেন, যার ভিত্তি গাঁথা হয়েছিল একাত্তরে। আওয়ামি লিগ মোদীর সফরকে সর্বাত্মক সফল বলছে। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিএনপি। সেই এক সময়ের কট্টর ভারতবিরোধী দলটিও মোদীর সফর নিয়ে বলছে, জনগণের সব ধরনের প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাম ঘরানার ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বলছে, আস্থার সোনার দরজা খুললেন নরেন্দ্র মোদী ও শেখ হাসিনা। জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা রওশন এরশাদ বলেছেন, মোদী যেভাবে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করেছেন, সেভাবেই তিস্তাও করবেন, এ আস্থা আমাদের আছে। ইন্দিরার পর আর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এমন আস্থার জয়ের পতাকা ওড়াতে পেরেছেন? নরেন্দ্র মোদী সফরের শেষ দিনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে যে ভাষণ দিয়েছেন, তা মানুষের অন্তর ছুঁয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু আহসান মোহম্মদ শামসুল আরেফিন সিদ্দিক-সহ কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী সবাই উচ্ছ্বসিত, বহুদিন পর একজন ‘মাটিতে দাঁড়ানো রাষ্ট্রনায়কের' ভাষণ শুনলাম।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৬ ও ৭ জুন বাংলাদেশ সফর করেন। ৬ জুন সকাল সোয়া দশটার দিকে ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ বিমান রাজদূতে। বিমানবন্দরে তাঁকে

স্বাগত জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, তিন বাহিনী প্রধান। প্রিয় অতিথিকে ২১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে বাংলাদেশের মাটিতে স্বাগত জানানো হয়, গার্ড অব অনার জানায় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল। মোদী বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে সরাসরি চলে যান সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে ছুটে আসেন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে যেখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করেন।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালো রাতে বঙ্গবন্ধুকে এই বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে দখলদার পাকিস্তানি সেনারা, সোজা বিমানে রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে যায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল পাকিস্তানপন্থী অফিসার জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করে। দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা স্বামীর সঙ্গে জার্মানি থাকায় বেঁচে যান। পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁদের ভারতে আশ্রয় দেন। নরেন্দ্র মোদী বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখেন, যেখানে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়, সেই সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান।

বিকেলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-শিলং-গৌহাটি সরাসরি বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আগে ঢাকা আসেন। ৬ জুন রাতে কলকাতা চলে যান। বাস সার্ভিস উদ্বোধনের পর দুই প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে মিলিত হন। প্রথমে একান্ত বৈঠকের পর প্রতিনিধিদল নিয়ে আলোচনা হয়। রাতে শেখ হাসিনা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ভোজে আপ্যায়িত করেন।

নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় কর্মসূচি শুরু হয় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পুজো দিয়ে। ভারতের অনেক প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতীক এই মন্দিরে কেউ আসেননি। ঐতিহাসিকরা বলেন, ঢাকার নামকরণ হয়েছে এই ঢাকেশ্বরী মায়ের নামে। মোদীই প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি এই মন্দিরে এলেন, পুজো দিলেন, আরতি করলেন, চরণামৃত নিলেন। এর পর দু-দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে হিন্দু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, প্রত্যেকের কাছে যান। এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে। এখানেও পুজো দেন, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ভক্তিগীতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং নিরাপত্ত বেষ্টনী ভেঙে সমবেত ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে যান বারিধারায় নতুন ভারতীয় হাইকমিশনের চ্যান্সারি ভবন উদ্বোধন করতে। তিনি সেখানে ভারত সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশে ছয়টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও উন্মোচন করেন। সেখান থেকে বঙ্গভবনে যান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের কাছ থেকে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা গ্রহণ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আজ আমার নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর পক্ষে একজন মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সম্মাননা নিচ্ছি, আমার পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। আমি আজ গর্বিত। গত বছর ক্ষমতায় আসার পর মোদী বলেছিলেন, ‘‘বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ বানিয়েছেন, আর তাঁরই কন্যা বাংলাদেশকে রক্ষা করেছেন।’’

ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনে মোদী।

বিকেলে সোনারগাঁও হোটেলে বিরোধী-দলীয় নেতা রওশন এরশাদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ও বেসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে বাম প্রতিনিধিদল এবং ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মাতলুব আহমেদের নেতৃত্বে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের একটি প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে দেখা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। খালেদা জিয়া নরেন্দ্র মোদীর কাছে দেশে গণতন্ত্র নেই বলে অভিযোগ করেন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মোদীকে সহায়তা করার অনুরোধ জানান। খালেদা মোদীকে বলেন, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারার অনুপস্থিতি গোটা অঞ্চলের জন্য অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। মোদী তাঁকে বলেছেন, ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। আমরা চাই সব দেশে গণতন্ত্র কাজ করুক। তবে ভারত মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত জনবক্তৃতায় মোদী বাংলায় বলেন, ‘‘আজ আমার সফর শেষ হচ্ছে, কিন্তু আমার মনে হয়, শুরু হলো।’’ তিনি আবার বাংলাদেশে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করে জীবনানন্দ আবৃত্তি করে বলেন, আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়। শেষ করেন তিনি এই বলে, ‘‘নোয়াখালি যাওয়ার ইচ্ছে ছিল গান্ধী আশ্রমে। এবার হলো না।’’ ▌

প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর

প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা

সত্য মিত্র

প্রধানমন্ত্রী হবার পর নরেন্দ্র মোদী একবছরে অনেকগুলি দেশ ভ্রমণ করলেন। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ। ভারত যখন ক্রমশ বিশ্বে একটি বড় মাপের অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠছে, তখন আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে ইসলামি মৌলবাদের দাপাদাপি ক্রমশ বেড়ে চলাতেও ভারতের ভূমিকা দিনে দিনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এরকম একটি পটভূমিকায় ভারতে যে একটি নতুন সরকার এসেছে সে পুরানো সরকারের জড়তা কাটিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাহসী ও নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালনে প্রস্তুত—এই বার্তাটি ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সফর ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অনেকদিন পর বিশ্ব ভারতের

তিনবিঘা করিডর

এক নতুন নেতাকে দেখল যিনি সচিবদের লিখে দেওয়া কাগজ মঞ্চে উঠে মিনমিন করে পড়ছেন না, একেবারে সরাসরি স্বতঃস্ফূর্ত বাগ্মিতায় সবাইকে মুগ্ধ করছেন।

এই সফরসূচির একেবারে বর্ষশেষের তালিকায় ছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটি প্রতিবেশী দেশ যার অনেকগুলি বিশেষত্ব ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ৪০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সীমান্তের দৈর্ঘ্য ২২১৭ কিলোমিটার। যেহেতু ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় বাংলাকে ভাগ করে তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তান (পরে বাংলাদেশ)। ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সম্পর্ক যেমন অত্যন্ত কাছের আবার তেমনি সংশয়াচ্ছন্নও বটে। বিশেষত সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই দুই অংশের ও ভারতের রাজনীতির জন্য সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর ও সফরকালে করা চুক্তিগুলি দু'দেশের সম্পর্কে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছে।

এবারের বাংলাদেশ সফরে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ছিল স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করা। শতাধিক বছর আগে কোচবিহারের রাজা ও রংপুরের রাজা নিজেদের মধ্যে তাস খেলায় তাদের নিজেদের রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বাজি ধরতেন। খেলায় হার-জিতের ফলে এভাবে দুই রাজার রাজ্যের মধ্যে পরস্পরের জমি থেকে যায় যেগুলিকে বলা হয় ছিট বা ছিটমহল। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর কোচবিহার রাজ্য ভারতে ও রংপুর পূর্বপাকিস্তানে যুক্ত হওয়ায় এইসব রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি দুটি দেশে থেকে যায়। ভারতে থাকা রংপুর রাজ্যের ছিটমহলগুলির অধিকার বর্তায় পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশের উপর এবং পাকিস্তানে থাকা কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহলগুলির অধিকার বর্তায় ভারতের উপর যা মূলত পশ্চিমবঙ্গে ও কয়েকটি অসমে। সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে আছে বাংলাদেশের ৭১টি ছিট ও বাংলাদেশে আছে ভারতের ১০৩টি ছিট। যে যার দেশের ছিটগুলির অধিকার পেয়ে যাবে যদিও কয়েকটি ছিটের ভবিষ্যৎ এখনো ঠিক হয়নি। এছাড়া সীমান্তে সামান্য কয়েকটি অংশ নিয়ে যে বিবাদ ছিল সেটিও যা যার দখলে আছে এই ভিত্তিতে অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভারতে যুক্ত হবে ৯৮৮৭ একর ও বাংলাদেশ পাবে ১৯৪২২ একর। এই সমস্যাটি অহেতুক চল্লিশ বছর ধরে পড়ে ছিল। এটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন ছিল সংবিধান সংশোধনের। প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সংসদে সব দলে সম্মতি নিয়ে এই সংবিধান সংশোধন করা একটি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়।

গত ৬ মে নরেন্দ্র মোদী ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এইজন্য শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর বাংলাদেশে আলোড়ন তুলেছিল এবং একজন শক্তিশালী দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশের সব মহলই স্বাগত জানিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আরেকটি সাফল্য তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত করা, কারণ এই জমি বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের জমিই মূলত জড়িত। এর আগের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরে মমতা যাননি। কিন্তু শুধু এটি নয় আরও বাইশটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার কয়েকটি ভবিষ্যতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কলকাতা-ঢাকা- আগরতলা বাস চলাচল

চুক্তি, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার। এর ফলে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের মূল অংশের যোগাযোগ ও বাণিজ্য আরও বাড়বে। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৬০০ একরের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল খোলার কথাও হয়েছে যেখানে ভারতীয় শিল্পপতিরা বাংলাদেশের জন্য দ্রব্য প্রস্তুত করতে পারবেন। ভারতীয় দুটি শিল্পগোষ্ঠী বাংলাদেশে দুটি বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও শিল্পমহল এই সফরে খুশি যা ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

এবার বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি একটু জেনে নেওয়া যাক। ২০০১ থেকে ২০০৬-এ বিএনপি ও জামাত জোটের নেত্রী খালেদা জিয়া ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০১-এর নির্বাচনের পর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর শুরু হয় চরম নির্যাতন। লক্ষাধিক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসেন। দুর্ভাগ্য এই যে এইসময় বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদ নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে। ২০০৯-এ আওয়ামি লিগ নেত্রী মুজিবুর-কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচনে জিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। শেখ হাসিনা ইসলামি মৌলবাদ দমনে কঠোর হয়েছেন। বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চালানো আসু ও অন্যান্য শক্তিগুলিকে তিনি কঠোর হাতে নিষ্ক্রিয় করেছেন। ফলে বিশেষত আসামে হিংসাত্মক আন্দোলন প্রায় বন্ধ হয়েছে। শেখ মুজিবের হত্যাকারী পাঁচজনকে ফাঁসি দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যাকারী পাকিস্তানপন্থী জামাত নেতাদের বিচার শুরু করেছেন ও ইতিমধ্যেই কয়েকজনের ফাঁসি হয়ে গেছে। ২০১৩-র ফেব্রুয়ারিতে শাহবাগ আন্দোলন জামাতে ইসলামের গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে শুরু হয়। এর বিরোধিতায় হিন্দু ও ভারত বিরোধী জামাতে ইসলামের সহযোগী হেফাজতে ইসলাম নামক সংগঠন মে মাসে কয়েক লক্ষ লোক নিয়ে ঢাকা মহানগর অবরোধ করে। শেখ হাসিনা কঠোর হাতে সেনাবাহিনী দিয়ে এই মৌলবাদী শক্তিকে একদিনেই ঢাকা থেকে বিতাড়িত করেন। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক এই সময়েই সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশকে সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার এটাই ঠিক সময় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তা সবচেয়ে সুচারুভাবে করেছেন।

এবার পশ্চিমবঙ্গের দিকে নজর ঘোরানো যাক। ত্রিশ বছর ধরে বামফ্রন্টের ইসলামি মৌলবাদকে লালন-পালন করার পর এবার হাল ধরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুসলমান ভোট সুনিশ্চিত করে পশ্চিমবঙ্গের রাজত্ব চিরস্থায়ী করতে ধর্মভীরু মুসলমান সমাজের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন এখানকার জামাতপন্থী ইমামদের হাতে। দরাজ হাতে মাদ্রাসা খুলছেন, ইসলাম প্রচারকারী ইমামদের হিন্দুদের আয় থেকে ভাতা দিচ্ছেন, দেশদ্রোহীকে সাংসদ বানাচ্ছেন, ইসলামি দৈনিক পত্রিকা চালু করেছেন। মমতার এই ইসলামি মৌলবাদের প্রেমে চিন্তিত বাংলাদেশের সুশীল সমাজ ও জামাতবিরোধী সব মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের জামাতকে খুশি করতে ভারত বিরোধিতাকে চাগিয়ে রাখতে চান যাতে পশ্চিমবঙ্গের মৌলবাদী মুসলমান নেতারা তাঁর সঙ্গেই থাকবেন। এজন্য তিনি প্রথমে ছিটমহল বিনিময়ের বিরুদ্ধে ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থরক্ষার যুক্তিতে এখনো তিস্তা চুক্তির বিরোধিতা করছেন।

কিন্তু এবার নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখা যাক বাংলাদেশের সঙ্গে এই চুক্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গে কী প্রভাব ফেলতে পারে ও আমাদের তাতে কি করণীয়। প্রথমেই ধরা যাক ছিটমহলে হস্তান্তরের বিষয়টি। অনেকে সমালোচনা করেছেন যে ভারত কিছু জমি হারিয়েছে, কিন্তু এই জমি কখনোই ভারতের দখলে ছিল না, তা ছিল বাংলাদেশের ভিতরে, আর দেশের তুলনায় এই জমির পরিমাণ যৎসামান্য। কিন্তু এই চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, ছিটমহলের অধিবাসীরা তাঁদের পছন্দমতন দেশের নাগরিক হতে পারবেন। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী ভারতে আছেন ১৪২১৫ জন যারা সবাই ভারতেই থাকবেন বলে ধরে নেওয়া যায়, কারণ এ নিয়ে তারা দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছেন। এ জনসংখ্যার বড় অংশ মুসলমান। বাংলাদেশে থাকা ছিটমহলের থাকা বাসিন্দা ৩৭৩৬৯ জন। এরা প্রায় সবাই মুসলমান কারণ বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতন এখানের হিন্দুরাও বিতাড়িত হয়েছেন। এই ৩৭ হাজার যা বেড়ে এখন অন্তত ৪০ হাজার হয়েছে। এরাও ভারতে আসার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছেন। কারণ ভারত একটি বিরাট দেশ ফলে যেখানে খুশি গিয়ে কাজের সুবিধা আছে। তাছাড়া এরা অনেকেই বাংলাদেশের বাড়িঘর নাগরিকত্ব বহাল রেখেই পশ্চিমবঙ্গে আসবেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ১৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৯ শতাংশ, সেখানে আরও ৫০ হাজার মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধি পাবে। চুক্তির সময় এই বিষয়টি মাথায় রেখে যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকবেন এরকম গোছের ব্যবস্থা করলে ভালো হোত। পশ্চিমবঙ্গের বিপদ বাড়ল। এছাড়া ভারতের উত্তরবঙ্গে প্রায় ৮০০০ একর দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা ছিটমহল বাংলাদেশের রয়ে গেল আর এই বাংলাদেশ থেকে এই ছিটমহলে আসরা জন্য তিনবিঘা করিডোর রয়ে গেল। এই করিডোর হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ থেকে চোরাচালানের স্বর্গ। এই সমস্যাটি এবারেই সমাধান করা প্রয়োজন ছিল।

তিস্তা চুক্তি এখনো হয়নি। মনমোহন সিংহের কংগ্রেস সরকার চুক্তির দলিল পাকা করেই ফেলেছিল। সিপিআইএমের সীতারাম ইয়েচুরি ইতিমধ্যে ঢাকা গিয়ে এই চুক্তির পক্ষে সওয়াল করে এসেছেন। ঠিক যেরকম জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের কথা না ভেবে মুসলমান তোষণের জন্য তড়িঘড়ি ফরাক্কা চুক্তি করেছিলেন। তিস্তা চুক্তির আগে তিস্তার বর্তমান জলের পরিমাণ ইত্যাদির বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সব তথ্য জানানোর পর এই চুক্তি হওয়া প্রয়োজন।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ স্থলপথ ও জলপথ চলাচলের জন্য অনুপ্রবেশ যাতে না বাড়ে তার জন্যও লক্ষ্য রাখতে হবে।

সবশেষে, বাংলাদেশের ৩০ শতাংশ হিন্দু সংখ্যালঘু আজ ৮ শতাংশে পরিণত হয়েছেন। এদের উপর আক্রমণ, নারীধর্ষণ, মন্দির ভাঙচুর সব সরকারের আমলেই চলেছে। কেন ভারত সরকার আজ পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করেনি--- পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে এই আলোচনাটিও শুরু হওয়া দরকার। ■

চিঠিপত্র

হিন্দুশূন্য হতে চলেছে বাংলাদেশ

'হিন্দুশূন্য হতে চলেছে বাংলাদেশ', হিন্দু কমতে কমতে ৮.৬ শতাংশে ঠেকেছে, ২৫.৫.১৫-এর স্বস্তিকায় সংবাদ প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রতিক্রিয়া। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের স্বজাতীয় দানবদের দ্বারা যেরকম নির্মমভাবে খুন, অত্যাচার ধর্ষণ ও ধ্বংসের শিকার হয়েছিল তাতে ভারত তার নিজের আর্থিক ও সামরিক ক্ষতি স্বীকার করেও পূর্ব পাকিস্তানকে সবরকম সাহায্য দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিল, অন্যথায় পূর্ব পাকিস্তানের কী অন্তিম পরিণতি হোত তা সময়ের ইতিহাস বলে দিত। মাথা উঁচু করে কলার তুলে বাংলাদেশের যে স্বাধীন অহঙ্কার তারা এযাবৎ দেখাতে পারছে তার জন্য ভারতের কাছে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা নেই সে দেশের। ভারত অবশ্য সেই আশা ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে ইসলামিক দেশে রূপান্তরিত করার পর থেকেই, কিন্তু তা বলে ঐ দেশে হিন্দুদের ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় অধিকারটুকুও ভারত আশা করার অধিকার রাখবে না কেন? হিন্দুদের জমি দখল, স্ত্রী-কন্যা ধর্ষণ, জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা, মুসলিমিকরণ, বিতাড়ন, সরকারি বা কোম্পানি চাকরি থেকে বঞ্চিতকরণ— কী করতে বাকি রাখছে ওরা?

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মিলিত আয়তনের একটা দেশকে এক হুমকি দিলেই যথেষ্ট; এমন একটি দেশকে দশকের পর দশক এমন গুরুতর অন্যায় সত্ত্বেও ভারত কাপুরুষের মতো নদীর জল, খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ করে যাচ্ছে। যেন ভারতই রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থানে আর বাংলাদেশ রয়েছে ভারতের অবস্থানে। প্রতিবেদক লিখেছেন— 'ভারতীয় নেতারা মনে করেন প্রতিবেশী রাজ্যে হিন্দুদের উপর যেভাবে অত্যাচার চলছে তা অন্যায়— কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারে না।' কথাটি লজ্জাকর সত্য। কিন্তু তাতে তাঁর বা তাঁর বংশধরদের শেষ রক্ষা হবে না একথাও হলফ করে বলতে পারি। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট-এর সৌজন্যে আফ্রিকার জঙ্গলে দেখেছেন নিশ্চয়— বিশালাকায় শক্তিশালী হাতির পিছনে দু-চারটি নেকড়ে তাকে খাওয়ার জন্য আক্রমণ করে, আর হাতি সহানুভূতির সঙ্গে নেকড়েগুলির ছেলেমানুষি এড়াবার জন্য বারবার পিছন ঘুরিয়ে সরে যেতে থাকে। অথচ এক একটি লাথি মারলে নেকড়ে পালাবার পথ পায় না। সে বোধ তার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে নেকড়েগুলি দলে ভারী হয়ে ১০/১২টি জুটে যখন চারদিক থেকে ঘিরে আক্রমণ করে, তখন হাতি নিরুপায় হয়ে ভূমি-ঘাসের বিছানায় বসে পড়ে আত্মসমর্পণ করে। অন্তিম পরিণতি আত্মবিনাশ। নেকড়েদের কৌশল যুদ্ধে জিতে তাদের সাহস বাড়তে থাকে আর পালোয়ান হাতি মরতে থাকে একটা একটা করে।

আজ নেতারা যেভাবে ব্যক্তি-স্বার্থের জন্য জাতিবিরোধী কাজ করছে তারা সেই সাহস পাচ্ছে শুধুমাত্র হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ না হওয়ার কারণে। নেতারাও বাংলাদেশের বা পাকিস্তানের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারবে সেই দিন যেদিন হিন্দুরা সব এককাট্টা হয়ে পথে নামতে পারবে, স্ব-অস্তিত্ব রক্ষার মহা-আন্দোলনে কম্পন ধরিয়ে দিতে পারবে। এই সম্ভাবনাময় সত্যটি হিন্দুদের মনে গেঁথে দেওয়ার কাজ করতে হবে সমস্ত হিন্দু সংগঠনগুলির একযোগে— এবং তা করা উচিত জঙ্গলের হাতির মতো দশা হবার আগেই।

—টিমিড পেনস্পিকার,
কল্যাণী।

বিজেপির আত্মসমালোচনা

গত ২৫ মে, ১৫-তে প্রকাশিত শ্রীদেবব্রত চৌধুরীর পৌরসভা ভোটের...আত্মসমালোচনা করি''--- সময়োপযোগী একটি রচনা। এমন ধরনের প্রকাশনার সত্যিই আজ প্রয়োজন। কিন্তু লেখকের আত্মসমালোচনার ক্ষেত্রে শুধু বাঙালিজাতিকে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্যামাপ্রসাদের সৃষ্ট দলটির পশ্চিমবঙ্গ শাখার ভূমিকারও একটু সমালোচনার (আত্ম) প্রয়োজন ছিল। যে বাঙালি জাতির প্রতি চরম অবহেলায় তিনি ধিক্কার ধ্বনি দিয়েছেন— তাঁরাই কিন্তু ১৯৫২ সালে শ্যামাপ্রসাদকে এখান থেকে জিতিয়ে দিল্লীতে তাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন, রাজ্য বিধানসভায় প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন ৯ জন। নিকট অতীতে অনেক আশায় তাঁরাই ভোট দিয়েছিলেন ১৮ থেকে ২৩ শতাংশ এবং সাম্প্রতিককালে (লোকসভা নির্বাচনে), যেখানে ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলোর চরম অনৈতিক খেলা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই ছিল সেখানেও কিন্তু এই বাংলা থেকেই শ্যামাপ্রসাদের সৃষ্ট দল, শ্যামাপ্রসাদের নাম মুখে উচ্চারণ না করেও ভোট পেয়েছিল। ২ শতাংশ থেকে লাফিয়ে উঠে ১৭ শতাংশ থেকে কোথাও কোথাও ২৭ শতাংশ পর্যন্ত। কিন্তু আসন দখল করতে গেলে যে ৩৬ শতাংশ থেকে শুরু করতে হয়— সেটা এমনি এমনি হয় না, তার জন্য এই বাঙালি জাতির কাছে যেতে হয়, সঙ্গে থাকতে হয়, কাছের মানুষ হতে হয়। শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদকেও অনেক ত্যাগ ও পরিশ্রম করে বোঝাতে হয়েছিল তিনি কি চেয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে শৌর্য দিয়ে, বীর্য দিয়ে, কঠিন পরিশ্রম ও দেশত্যাগের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে প্রমাণ করতে হয়েছিল তিনি দেশটাকে কতটা ভালবেসে ছিলেন।

দেবব্রতবাবু নিজে অনেকদিন এই দলটির রাজ্য নেতৃত্বে আছেন, তিনিই বলুন না রাজ্য স্তরে যারা দীর্ঘদিন ধরে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, গত লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁদের মধ্যে কতজনের বাড়িঘর স্থানীয় মানুষজন চিনত বা বিজেপি-র একজন কার্যকর্তা হিসাবে জানত।

আদর্শ নিয়ে সমাজের নিকট যাওয়া তো দূরস্থান এলাকাবাসীরা তাদের কোনো খবরই রাখতেন না। জনগণ ও সংগঠনকে দূরে সরিয়ে রেখে নির্বাচন নামক খেলাটা খেলা যায় না। ভুলভ্রান্তিতে ভরা আদর্শ নিয়ে, পাকিস্তানের দাবিদার কমিউনিস্ট পার্টি, সেই

পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের যদি দিনের পর দিন ভুল বুঝিয়ে তাদেরই সমর্থনে তাদেরই সব থেকে বড় শত্রু ছত্রিশ বছর এখানে রাজত্ব করে যেতে পারল তবে যিনি নিজের জীবন দিয়ে এই চরম ক্ষতির হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তার উত্তরসূরিরা এই বঞ্চিত মানুষগুলোকে কিছুই বোঝাতে পারল না। এ দায়িত্ব কার?

যে কংগ্রেস ধান্দাবাজির জন্য দেশভাগ মেনে নিয়ে বাঙালি জাতির মেরুদণ্ডে আঘাত করেও এই সেদিন পর্যন্ত বিপুল ভ্রষ্টাচারিতায় সিংহাসনে বসেছিল এবং আজও পর্যন্ত তাদেরই উত্তরসূরিরা (তৃণমূল কংগ্রেস) এখানে প্রভূত্ব কায়েম করে রেখেছে। অথচ লেখকের কথায় বাংলার স্বার্থে যে দলের জন্ম হয়েছিল সেই দলটি বাঙালি মনের মণিকোঠাটি ছোঁয়া তো দূরের কথা তাদের ঘরের চৌকাঠটাই পার হতে পারল না। এত লাঞ্ছনা, এত বঞ্চনা এই জাতিটি সইল তার কারণ বোধহয় একটাই, দিগভ্রান্ত বাঙালি বুঝতেই পারল না তাদের প্রকৃত বন্ধু কারা। আজ এত বছর ধরে যেসব রাজনৈতিক দলগুলোর ধাপ্পাবাজি, মিথ্যাচারিতা, আদর্শের নামে নীতিহীনতা তারা দেখেছে।

সেইরকম ধারার আরেকটি দলকে তারা বিশ্বাস করবে কি করে। এবিষয় গত ২০ এপ্রিল সংখ্যায় পুরসভা নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচ্ছদ নিবন্ধে অম্লান কুসুম ঘোষ তাঁর রচনার চার নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন তা অবশ্যই লক্ষণীয়। শ্যামাপ্রসাদের নামে নট-নটি-গায়ক-গায়িকা ও যাদুকররা যদি দলের নেতৃত্ব দেয় তাহলে অনুভূতিশীল বাঙালিতো তাদের অনুসরণকারী হবে না। তাই আত্মসমালোচনাই যদি করতে হয় তার ক্ষেত্রও উদারভাবে আরো বিস্তারিত করতে হবে, বালিতে মুখ গুজলে শরীরও ঢাকা পড়ে না, মরুঝড়ও বন্ধ হয় না। অনেকদিন আগে সঙ্ঘ-আদর্শে শ্রদ্ধাশীল স্বনাম খ্যাত পবিত্রকুমার ঘোষ তার একটি প্রবন্ধে গভীর অর্থবহ একটি বাক্য লিখেছিলেন, "অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না"। তাই আজ একটু অন্য আঙ্গিকে চিন্তা করা ভাল, সেটা স্বাস্থ্যসম্মতও হবে। যাদের হাতে দায়িত্ব ছিল এই দ্বিখণ্ডিত বাঙালি জাতির পাশে দাঁড়াবার, তাদের ব্যর্থতার সমস্ত ভারটা সমগ্র বাঙালিজাতির ওপর চাপিয়ে দিলে আরেকটি ব্যর্থতা ও হতাশার জন্ম দেবে। বাঙালি নিজেদের দোষ যতদিন অপরের ঘাড়ে চাপাবে ততদিন এই দুর্ভাগা বাঙালি জাতির কোনো উন্নতি হবে না। গত লোকসভা নির্বাচনে বিনাশ্রম ত্যাগ স্বীকারে, সঠিক পরিকল্পনাহীন নির্বাচন যুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গবাসী আশীর্বাদস্বরূপ যতটা ভোট দিয়েছেন, ধিক্কারধ্বনি দেওয়ার আগে, তার জন্যও বিনম্রচিত্তে এতটুকুও কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলে বিধাতার কাছে সুবিচার পাওয়া যাবে তো?

—**তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়,**
৬৬, রামঘোষ রোড,
কলকাতা-৭০০০৪০।

জাত জালিয়াতের খেলা

গত ১০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালবাসীর জন্য সাহায্য হিসাবে পাকিস্তানের গোমাংস পাঠানোর খবরটি পড়লাম। সেখানকার মুসলমান অধিবাসীদের কথা ভেবেই হয়তো এই গোমাংস পাঠানো, যাতে কোনো মুসলমান ক্ষুধায় প্রাণ না ত্যাগ করে। অথবা এও হতে পারে কয়েকপুরুষ আগে তারা যেভাবে তাদের মূল কৃষ্টি ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ঠিক তেমনভাবেই আরও কিছু হিন্দুকে গোমাংস গর্লাধঃকরণ করিয়ে, তাদের সাংস্কৃতিক উন্মূলন ঘটিয়ে পাকিস্তান নিজের অন্তরের চির প্রজ্জ্বলিত দাহকে প্রশমিত করতে চায়। পাকিস্তান ভুলে থাকতে ভালোবাসে যে এটা একবিংশ শতাব্দী ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার স্থান এখানে নেই।

গোরু আমাদের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মেরুদণ্ড স্বরূপ, জন্মাবধি আমাদের নানাভাবে রক্ষা করার গুণে মাতৃস্বরূপা। এ কৃতজ্ঞতা সকল ভারতবাসীর মনে দৃঢ় ভাবে আঁকা রয়েছে। কোনো কারণে যদি সেই মাতৃমাংস গলাধঃকরণ হয়ে যায় তবে অনুতপ্ত হিন্দু যাতে জাতিচ্যুত না হয় তা দেখা সমাজের কর্তব্য। আমরা সেই কর্তব্যে অবহেলা করেছি বলেই আজ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান ও পূর্বদিকে বাংলাদেশ নিজেদের অস্তিত্ব এভাবে জাহির করে চলেছে। তারা কীভাবে নিজেদের জন্মলগ্ন থেকে জাত-জালিয়াতের জুয়াখেলা চালিয়ে যাচ্ছে তা যাটোর্ধ্ব সকল মানুষেরাই জানে।

জাত ছেলের হাতের মোয়া নয়। একথা সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে, গল্পের মাধ্যমে, প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রচার করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত এভাবে কোনো হিন্দুর জাত আর কেড়ে নেওয়া যাবে না।

আমি সেই সব মানুষদের দেখে এসেছি যাঁরা গোমাংস গলাধঃকরণ করেও বা কলমা পরেও হিন্দু রয়ে গেছেন। নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ার পাপ তাঁরা গঙ্গাজল পান করে স্খালন করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কি সহজ মুক্তির উপায়! কি সুন্দর বুদ্ধি!

এই প্রক্রিয়ার প্রচার সারা ভারত জুড়ে হওয়া উচিত। তাহলে আর এভাবে কোনো হিন্দুর জাত যাবে না। হিন্দুধর্মের যদি কোনো রক্ষক থাকেন, তাঁদের এ ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া উচিত। ধর্মগুরুরাও এই বিষয়টিকে যদি নিজেদের দায়িত্বের মধ্যে আনেন তো আরও ভাল। আমরা তো সবরকম পূজার আগেই কোশার জলকে গঙ্গোদকে পরিণত করে নিই। শুধু গঙ্গোদক বলা ভুল হবে, সব নদী— গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী (অধুনা লুপ্ত হলেও) নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী--- সকল নদীকেই পূজার জলে আবাহন করে নিই 'জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু' বলে। যাদের কাছে এমন বিরাট সম্পদ রয়েছে তাদের জাত জালিয়াতদের ভয়ের ব্যাপারই নেই। আমরা যে কাজ করি তাতে বিশ্বাস রাখব না কেন? অধঃপতনে বিশ্বাস রাখি, জাতি চ্যুতিতে বিশ্বাস রাখি কিন্তু মুক্তির উপায়ে রাখি না কেন? সে বিশ্বাস যে কি বিরাট ক্ষমতা ধরে তা চাক্ষুষ করে এসেছি। সেই বিশ্বাসেই সকলকে এগিয়ে যেতে হবে। সেই বিশ্বাসের জোরেই গঙ্গোদক পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো মুহূর্তে পাওয়া যাবে— এতটাই তা সহজ লভ্য।

তাই হিন্দুর জাতিচ্যুতির ভয় কোথায়? আমাদের শুদ্ধি গঙ্গোদক পানে এবং তা অতি সহজলভ্য। শুধু একথা বলা চাই, বিশ্বাস করা চাই।

—**গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়,**
কসবা, কলকাতা।

ভারতমাতার আত্মিক মেলবন্ধনের স্থানগুলি

রবীন সেনগুপ্ত

প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ভারতমাতার মেলবন্ধনের স্থানগুলি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে যে সকল স্থান পূর্বেও এদেশের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হোত, অদ্যাপিও সেই স্থানগুলির মহিমা অক্ষুণ্ণ আছে। চারধাম, পঞ্চকেদার, সপ্তবদ্রী, দ্বাদশ প্রয়াগ, নয়টি পবিত্র অরণ্য, সপ্তমোক্ষপুরী, পঞ্চকাশী, পঞ্চমোক্ষ সরোবর, সপ্তমোক্ষক্ষেত্র—এইগুলি হল ভারতআত্মার মেলবন্ধনের চিরস্থায়ী কেন্দ্র। এতগুলি বৈদেশিক আক্রমণের পরও এই স্থানগুলি আজো ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেটি অতীব শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ের ব্যাপার।

কেদারনাথ, মদমহেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর— এই পাঁচটি তীর্থকে একত্রে বলা হয় পঞ্চকেদার।

বদ্রীনাথ, আদিবদ্রী, তিব্বতের থলিঙ্গমঠের বদ্রী, নৃসিংহ বদ্রী, যোগবদ্রী, ভবিষ্যবদ্রী এবং বৃদ্ধবদ্রী— এই কয়টি হিমালয় পর্বতমালায় অবস্থিত স্থানকে একত্রে বলা হয় সপ্তবদ্রী। এর মধ্যে তিব্বত রাজনৈতিক ভাবে বর্তমানে ভারতের নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে অখণ্ড ভারতমাতার আঁচলের মধ্যেই আজো তিব্বত রয়েছে।

দ্বাদশ প্রয়াগ কোনগুলি? গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলনস্থল প্রয়াগের নাম তো প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু বাকি এগারোটি প্রয়াগের নাম কি? সেগুলি কোন কোন নদীর সঙ্গমস্থল? এ প্রশ্নেরও উত্তর জানা দরকার। বাকি এগারোটি প্রয়াগের নাম হলো— দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, সোমপ্রয়াগ, বিষ্ণু প্রয়াগ, সূর্য প্রয়াগ, ইন্দ্র প্রয়াগ, ভাস্কর প্রয়াগ, হরি প্রয়াগ, গুপ্ত প্রয়াগ, শ্যাম প্রয়াগ এবং কেশ প্রয়াগ। এর মধ্যে দেবপ্রয়াগ হলো অলকানন্দা ও ভাগরথীর মিলনস্থল, রুদ্রপ্রয়াগ— অলকানন্দা ও নন্দার মিলনস্থল। সোমপ্রয়াগ— সোমনদ ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল, বিষ্ণুপ্রয়াগ— বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল, সূর্যপ্রয়াগ— মন্দাকিনী ও অলশতরঙ্গিনীর মিলনস্থল, ইন্দ্রপ্রয়াগ— ভাগীরথী ও ন্যাসগঙ্গার মিলনস্থল, ভাস্করপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে ভাস্করগঙ্গা ও ভাগীরথী, হরি প্রয়াগে মিলিত হয়েছে হরিগঙ্গা ও ভাগীরথী, গুপ্ত প্রয়াগে নীলগঙ্গা ও ভাগীরথী, শ্যাম প্রয়াগে শ্যামগঙ্গা ও ভাগীরথী এবং কেশ প্রয়াগে অলকানন্দা ও সরস্বতী।

নয়টি মহা পবিত্র অরণ্যের নাম হলো— দণ্ডকারণ্য, সৈন্ধ্যবারণ্য, পুলকারাণ্য, নৈমিষারণ্য, কুরুজাঙ্গল, উৎপলবর্তকারণ্য, জম্বুমার্গ ও হিমবদরারণ্য।

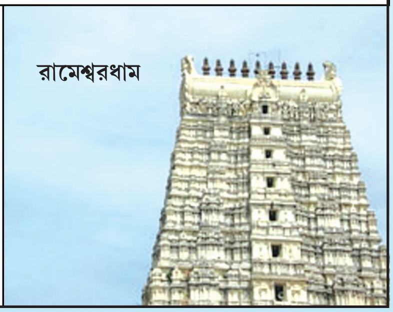

সপ্তমোক্ষপুরীর নাম অনেকেই জানেন— বারাণসী, কাঞ্চীপুরী, মায়াপুরী (হরিদ্বার), অযোধ্যা, মথুরা এবং অবন্তীপুরী (উজ্জয়িনী)।

পঞ্চমোক্ষ সরোবর হলো তিব্বতের মানস সরোবর, রাজস্থানের পুষ্কর সরোবর, মহীশূরের পম্পা সরোবর, সিদ্ধপুরের বিন্দু সরোবর এবং গুরজরাটের কচ্ছ এলাকার নারায়ণ সরোবর।

সপ্ত পবিত্র ক্ষেত্রে হলো— কুরুক্ষেত্র (হরিয়ানায়), হরিহরক্ষেত্র (শোনপুরে), প্রভাসক্ষেত্র (গুজরাটে), রেণুকাক্ষেত্র (মথুরায়), ভৃগুক্ষেত্র (ভরুচে), পুরুষোত্তম ক্ষেত্র (পুরীতে) এবং সুকর ক্ষেত্র (শাঁরোতে)।

ভারতের চারপ্রান্তে অবস্থিত চারধাম হলো— বদ্রীনাথধাম, দ্বারকাধাম, জগন্নাথধাম ও রামেশ্বরধাম। এই চারধামে যেন বাকি সব তীর্থকে চারিদিক দিয়ে পাহারা দিচ্ছে যুগ যুগান্ত ধরে।■

শ্রীচৈতন্যপরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

চন্দনেশ্বরের ‘ভদ্র’ দেউল

ড. প্রণব রায়

খড়্গাপুর স্টেশন থেকে খড়্গাপুর কাঁথি বাসে দক্ষিণমুখী পাকা রাস্তায় প্রথমে বেনাপুরে নেমে পরে ওখান থেকে পূর্বমুখী একটি কাঁচা রাস্তায় তিন মাইল অতিক্রম করলে এখানে আসা যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গাপুর লোক্যাল থানার অন্তর্গত এই সাঁকোয়া বা সাঁকুয়াগ্রামে চন্দনেশ্বর শিবের ‘ভদ্র’ (পিঢ়) রীতির মূল মন্দির ও তৎসংলগ্ন ‘জগমোহন (এটিও ‘ভদ্র’ বা ‘পিঢ়’-রীতির) এই স্থানের একটি বিস্ময়। এই দূরবর্তী গ্রামে ওড়িশী রীতির মন্দির সমগ্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে কেশিয়াড়িতে লক্ষ্য করা যায়। যেখানে মূল মন্দিরও ‘রেখ’ বা ‘শিখর’ দেউল রীতির না হয়ে শুধুমাত্র ‘ভদ্র’ রীতিতে নির্মিত হয়েছিল।

ওড়িশী রীতিতে মূল মন্দির সাধারণত ‘শিখর’ দেউল রীতিতে হয় এবং সংলগ্ন ‘জগমোহন’, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ ‘ভদ্র’ বা ‘পিঢ়’ রীতিতে তৈরি হয়।

সাঁকোয়ার এই মন্দির কিন্তু এই প্রথা অনুসরণ না করে দুটিই ‘ভদ্র’-রীতিতে তৈরি হয়েছিল। চন্দনেশ্বরের এই মন্দিরের দুটি অংশ— মূলমন্দির ও ‘জগমোহন’ (পরিদর্শনকক্ষ)। দুটি মন্দিরের মধ্যবর্তী ‘অন্তরাল’ও আছে। মাক্‌ড়া পাথরে তৈরি এই মন্দির পশ্চিমমুখী। ‘গর্ভগৃহে’র মেঝে জগমোহনের তুলনায় কিছুটা নিচু। ‘জগমোহন’ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে গর্ভগৃহে নামতে হয়। শিবলিঙ্গ গম্ভীরা মধ্যে অদৃশ্য।

এই মন্দিরে কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠাকালের লিপি নেই। সংস্কারকাল শুধু জানা যায় সন ১৩২৬ সাল (১৯১৯ খৃষ্টাব্দ)। শোনা যায়, বিপ্রমোহন চৌধুরী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠাকাল জানা না গেলেও স্থাপত্যশৈলীদৃষ্টে এটিকে কেশিয়াড়ির সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সমসাময়িক মনে করা যায়। অর্থাৎ খৃষ্টীয় সতেরো শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত মনে করা যায়। দেওয়ালের কোথাও কোনো মূর্তি ভাস্কর্য চোখে পড়ে না। কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে গম্ভীরার পাশে একটি ভগ্ন চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি বেশ প্রাচীন। আর একটি নৃত্যরতা ষড়ভুজা মূর্তি বাইরে মন্দিরপ্রাঙ্গণে লক্ষ্য করা যায়।

পরম্পরা

চৈত্র সংক্রান্তিতে ও তার আগের দিন থেকে সাঁকোয়ায় চন্দনেশ্বরের আকর্ষণীয় চড়কগাজন হয়। এই গাজনমেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ‘পঞ্চরত্ন খাঁড়াপাট’। চড়কমেলার দিন বিশেষ এক পদ্ধতিতে বাঁশের তৈরি একপ্রকার খাঁড়া মন্দিরের ভিতর পাঁচটি লোহার খাঁড়ার ওপর পাঁচজন ভক্ত্যা গ্রামের ‘জানকীমিশ্র’ নামক পুকুরে স্নান করে অপরের কাঁধে চড়ে আসে এবং ওই খাঁড়াপাটকে শত শত মানুষ কাঁধে বহন করে আনে।

সাঁকোয়া ও তার আশপাশে নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে পুরাকীর্তির কিছু নিদর্শন। জানা যায়, বলরামপুরের রাজা বিপ্রমোহন চৌধুরী চন্দনেশ্বরের স্বপ্নাদেশে এই স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বিপ্রমোহন মন্দিরের পশ্চিম পাশে ‘মসরা’ ও দক্ষিণপাশে ‘বাগুলিয়া’ নামে দুটি দিঘিও খনন করান। গ্রামের পূর্ব পাড়ায় একটি ছোট ঢিবির পাশে মাকড়া পাথরের একটি বড় ‘আমলক’-শিলা মাটিতে পোঁতা দেখা যায়। তার পাশে আরো পাথর আছে। এই আমলকশিলা নিশ্চয়ই কোনো মন্দিরশীর্ষে স্থাপিত ছিল।

এই সব পুরাবস্তু থেকে সাঁকোয়া গ্রামের প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। এটি যে একসময় জনবহুল ও সমৃদ্ধ স্থান ছিল, তা বলাবাহুল্য। চন্দনেশ্বর মন্দির তারই এক নিদর্শন। ■

স্বস্তিকা

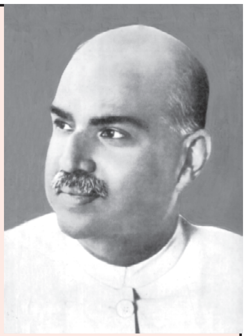

শ্যামাপ্রসাদ
স্মরণ
সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ৬ জুলাই, ২০১৫

মূল্য : ১০ টাকা

সত্বর কপি বুক করুন

শ্রীরাম-জননী কৌশল্যা

রূপশ্রী দত্ত

পুরাকালে মনুশতরূপা নামে এক কন্যা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি দেবতা বিষ্ণুকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করেছিলেন। বিষ্ণু তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, পরজন্মে বিষ্ণু রামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন এবং মনুশতরূপা তাঁর জননী হবেন।

মনুশতরূপা কোশল দেশের রাজকন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর কৌশল্যা নামকরণ করা হলো। যথাসময়ে অযোধ্যার রাজা দশরথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হলো। এদিকে, লঙ্কার রাজা রাবণ একদিন দৈববাণীতে জানলেন যে, দশরথ-কৌশল্যার পুত্র রাম তাঁর নিধনের কারণ হবেন। তখন রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে একটি বৃহৎ মাপের বাক্স জোগাড় করলেন। কৌশল্যাকে সৈন্যসামন্ত দ্বারা অপহরণ করে বাক্সবন্দী করে সমুদ্রের মধ্যবর্তী এক জনহীন দ্বীপে রেখে এলেন। নারদমুনি সেকথা জানতে পেরে দশরথকে খবর দেন এবং দশরথ সৈন্যসামন্ত সমেত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। কৌশল্যাকে উদ্ধার করে দশরথ তাঁকে বিবাহ করেন। রাবণের মনে তখন থেকেই আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

অযোধ্যারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠা ও প্রধানা মহিষী হলেন কৌশল্যা। কৌশল্যার দুই সপত্নী ছিলেন— কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন রাজা দশরথ। বহুদিন নিঃসন্তান থাকার পর এই যজ্ঞের দৈব পায়সান্ন ভক্ষণ করে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা পুত্রবতী হয়েছিলেন। কৌশল্যার পুত্রের নামকরণ হলো রাম। কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং দুই'বার পায়স ভক্ষণের ফলে সুমিত্রার দুই পুত্রের নাম হলো, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

অস্ত্র বিদ্যা, পুঁথিগত বিদ্যা— সব বিদ্যা গ্রহণেই পুত্রেরা— বিশেষত রাম অত্যন্ত সুদক্ষ হয়েছিলেন। যথাসময়ে মিথিলার রাজা জনকের কন্যা সীতা'র সঙ্গে স্বয়ংবর সভার মাধ্যমে রামের বিবাহ হল।

কৌশল্যার অন্যতম সপত্নী কৈকেয়ী একবার দশরথের গুরুতর অসুস্থতার সময় তাঁকে সেবাপূর্বক সুস্থ করে তোলেন। দশরথ খুশি হয়ে তাঁকে বরপ্রার্থনা করতে বলেন। কৈকেয়ী তখন দশরথের সেই দুর্বলক্ষণে তাঁর মনোমত দু'টি বর প্রার্থনা করলেন। প্রথমত, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর পুত্র ভরত। দ্বিতীয়ত, রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে প্রেরণ করতে হবে। দশরথ এই অপ্রত্যাশিত উক্তি শুনে মর্মাহত হলেন। রাম তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র। বিধিসম্মতভাবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁরই হওয়া উচিত। কিন্তু নিরুপায় দশরথ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৈকেয়ীর অসঙ্গত প্রস্তাবেও তাঁকে সম্মত হতে হলো।

কৌশল্যাও মনে শোলসম আঘাত পেলেন। তিনি প্রাণাধিক পুত্র রামকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না, তাই তিনিও বনবাসে সহযাত্রিণী হতে চাইলেন। রাম তখন আপন জননীকে বোঝালেন যে, সতী নারীর ধর্ম স্বামীর অনুগামিনী হওয়া। স্নেহশীল পিতাও নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। তিনিও প্রভূত মনোকষ্টে আছেন। পুত্রের কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি রাম-সীতার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বানবাসযাত্রার প্রাক্কালে গোছাতে নিযুক্ত হলেন। ভরত তখন মাতুলালয়ে ছিলেন। সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ তাঁদের সহযাত্রী হলেন। রথের সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনরতা কৌশল্যা কিছুদূর গেলেন। তারপর তাঁকে গৃহে আনা হল। বুদ্ধিমতী ও বিবেচনা সমন্বিতা নারী কৌশল্যা, স্বামীকেও উপদেশ দিলেন। দশরথ তখন আহার-পানীয় ত্যাগ করে ঘোরতর অসুস্থ। প্রজারা বিমর্ষ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কৌশল্যা বললেন, প্রজাদের কল্যাণসাধনের জন্যই দশরথকে সুস্থ থাকতে হবে। ভরত মাতুলালয় থেকে ফিরে জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর বনবাসযাত্রার কথা আদ্যোপান্ত শুনে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন জননী কৈকেয়ীর প্রতি। কৌশল্যা এমনই উদার হৃদয়া, ক্ষমাশীলা, ও স্নেহশীলা নারী যে ভরতকেও তিনি বোঝালেন যে, রামের বনবাস দৈবনির্দিষ্ট। দৈবনির্বন্ধ কেউ খণ্ডাতে পারে না। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা চিত্রকূট পর্বতে স্থিত রামলক্ষ্মণ সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এলেন। ভরত জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে সিংহাসনে স্থাপন করে প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। চৌদ্দ বছর পরে রামের প্রত্যাবর্তন। কৌশল্যার মনে হয়েছিল, স্বামীপুত্রের প্রতি তিনিই হয়তো যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। পুত্রবধূ সীতা তখন বলেছিলেন—'জননী, তুমি ছাড়া আমিও তো স্বামীপুত্র কিছুই লাভ করতে পারতাম না।' রাম জন্মাবার আগে লেখা রামায়ণ, কেন্দ্রচরিত্র কৌশল্যা ব্যতীত অসম্ভব ছিল। কৌশল্যা রামায়ণের আদর্শ চরিত্র। তিনি স্নেহশীলা, স্বার্থজ্ঞানশূন্য, উদারহৃদয়া, মানসিক প্রসারত্বময়ী নারী। ▌

বাঘ বর

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক গরিব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ঘরে ব্রাহ্মণী ছিলেন, আর ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল, অন্য কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে ভিক্ষে করে যা আনতেন, একবেলা ভাল করে না খেতেই তা ফুরিয়ে যেত। কোনো দিন আবার তাও মিলত না।

একদিন সময় ব্রাহ্মণ ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণী কাঁদছেন। দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছ কেন ব্রাহ্মণী, কী হয়েছে?

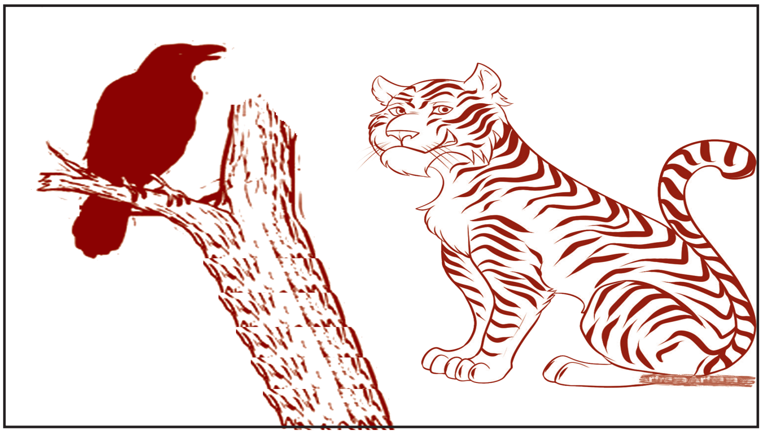

ব্রাহ্মণী বললেন, 'মেয়ে পায়েস খেতে চেয়েছে, পায়েস কোত্থেকে দেব তাই আমি কাঁদছি।'

শুনে ব্রাহ্মণ বললেন, 'আচ্ছা, আমি দেখছি এর একটা কিছু করতে পারি কিনা, তুমি কেঁদ না।' বলে তিনি তখুনি আবার বেরিয়ে গেলেন।

সেই গ্রামে একজন জমিদার ছিলেন।

তিনি যেই শুনলেন ব্রাহ্মণের মেয়ে পায়েস খেতে চেয়েছে, অমনি তাঁকে চমৎকার গোপালভোগ চাল, দু-সের দুধ, চিনি আর মশলা দিলো।

ব্রাহ্মণ তাতে খুব খুশি হয়ে, জমিদারকে আশীর্বাদ করে, ছুটে বাড়ি এসে ব্রাহ্মণীকে বললেন, 'এই নাও, তোমার পায়সের জোগাড় এনেছি।'

সেই ব্রাহ্মণী লক্ষ্মী মেয়েই ছিলেন। তিনি এমন সুন্দর রাঁধতেন যে তেমন রান্না কেউ কখনো খায়নি। তিনি যখন পায়েস রাঁধতে লাগলেন, তখন তার চমৎকার গন্ধে আশেপাশে সকল লোক পাগল হয়ে উঠল।

একটা কাক সেই পায়েসের গন্ধ পেয়ে বললে, 'আহা! এমন চমৎকার জিনিস একটু না খেয়ে দেখলে চলছে না!' বলেই অনেকক্ষণ ধরে ঘরের চালে চুপ করে বসে রইল। তারপর রান্নাঘরে একটু গন্ধ হতেই সে বললে, 'ওই! এবারে রান্না হয়েছে!'

খানিক বাদে আর একটু শব্দ হল, আর অমনি কাক বললে, 'ওই! এবারে ভাত বাড়ছে!'

খানিক বাদে আর একটু শব্দ হল, অমনি কাক বলল, 'ওই! এবারে খাচ্ছে!'

সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণ আর তাঁর মেয়ে তখন খেতে বসেছিলেন। সে পায়েস এতই ভাল হয়েছিল যে, তাঁরা দু'জনেই তা প্রায় শেষ করে ফেললেন। ব্রাহ্মণীর জন্যে খুব কম রইল। তারপর ব্রাহ্মণীর খাওয়া যখন শেষ হল, তখন পাতে বা হাঁড়িতে পায়েসের একটু দাগ অবধি রইল না।

কাক এতক্ষণ বসে থেকেও যখন কিছু খেতে পেল না, তখন বড্ড রাগ হল। সে মনে মনে বললে, 'আমাকে এমন করে ঠকালে। এর শোধ নিতেই হবে।'

ব্রাহ্মণীর বাড়ির কাছেই একটা প্রকাণ্ড বন ছিল, সেই বনে মস্ত একটা বাঘ থাকত।

কাক দুষ্টু ফন্দি এঁটে সেই বাঘকে গিয়ে বললে, বাঘমশাই, আমাদের ব্রাহ্মণ ঠাকুরের এমনি যারপরনাই সুন্দরী মেয়ে আছে। আপনি এমন সুন্দর বর, আপনার সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে হলে ভালো হয়।'

বাঘ বললে, 'বিয়ে ঠিক করে দেবে কে? আমি কথা কইতে গেলে তো তারা ছুটে পালাবে!'

কাক বলল, আপনার কিছু করতে হবে না, আমি সব করে দিচ্ছি। আগে আপনি ব্রাহ্মণীকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন।'

বাঘ বলল, 'বেশ কথা। আমি গ্রামে গিয়ে কুত্তা মেরে বামুনের বাড়ি রেখে আসব।'

কাক তা শুনে জিভ কেটে বললে, 'না না! তারা কুত্তা খাবে না। আপনার বাড়িতে যে লেবুর গাছ আছে, সেই গাছের লেবু পাঠিয়ে দিন। আমি লেবু নিয়ে যাব এখন।'

শুনে বাঘ আহ্লাদে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। এমনি করে কাক রোজ লেবু নিয়ে যায় আর বাঘকে এসে বলে, 'তারা মেয়ে বিয়ে দেবে।' আসলে সেটা মিথ্যে কথা, কিন্তু বাঘ মনে করে, ব্রাহ্মণ বুঝি সত্যি সত্যি মেয়ে দেবে বলেছে।

তারপর একদিন বাঘ বললে, 'কই লেবু তো ফুরিয়ে গেল, মেয়ে বিয়ে দিল না!'

কাক বললে, 'দেবে বইকি! আপনি যখন চাইবেন, তখুনি দেবে।'

শুনে বাঘ বললে, 'তবে তাদের বল গিয়ে যে, যদি কাল রাতে মেয়ে বিয়ে না দেয়, তাহলে তাদের সবাইকে চিবিয়ে খাব।'

কাক তো তাই চায়। সে তখুনি ব্রাহ্মণের বাড়ি গিয়ে বললে, 'ওগো শুনছ? কাল রাতে বাঘ আসবে, তোমাদের মেয়েকে বিয়ে

করতে। যদি বিয়ে না দাও সকলকে চিবিয়ে খাবে।’

একথা শুনে তো ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন।

কান্না শুনে গ্রামের লোক ছুটে এসে বললে, ‘কী হয়েছে?’

ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘কাল বাঘ আসবে, আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে। বিয়ে না দিলে সকলকে চিবিয়ে খাবে।’

শুনে গ্রামের লোক বললে, ‘এই কথা! আচ্ছা, দেখা যাক বেটা কেমন বিয়ে করে, আর না দিলে চিবিয়ে খায়! আপনার কোনো ভয় নেই, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি।’

তারা বাঘের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলে, ‘বাঘমশাই, আপনার মতন এমন ভাল বর আর কি হবে। আপনি পোশাক পরে আসবেন, সভার মাঝে বসবেন, গানবাজনা শুনবেন, নিমন্ত্রণে থাকবেন এরপর বেশ ভালমতো বিয়ে করবেন।

তারপর তারা ব্রাহ্মণের উঠোনে তিনশো উনুন কেটে তিনশো হাঁড়ি তেল চড়াল। কুয়োর উপর চমৎকার বিছানা করে রাখল। তারপর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে খুব শোরগোল করতে লাগল।

বাঘ সেই গোলমাল শুনে বলল, ‘ওইরে আমার বিয়ের ধুম লেগেছে!’ তখন সে তাড়াতাড়ি জামা জোগাড় করে, পাগড়ি এঁটে নাচতে-নাচতে এসে ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হলো। অমনি সকলে ‘আরে বর এসেছে! বাজা বাজা!’ বলে বাঘমশাইকে সেই কুয়োর উপরে বিছানা দেখিয়ে দিলে। বাঘমশাই তো তাতে লাফিয়ে বসতে গিয়েই বিছানাসুদ্ধ কুয়োয় পড়েছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলে মিলে সেই তিনশো হাঁড়ির গরম তেল আর তিনশো উনুনের আগুন কুয়োয় এনে ফেলেছে।

তারপর দেখতে দেখতে বোকা বাঘ পুড়ে ছাই হলো, ব্রাহ্মণের বিপদ কেটে গেল।

কাক তামাশা দেখার জন্যে ঘরের চালে বসেছিল। পাড়ার ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দিল।

প্রশ্নবাণ

১. ভারতের জাতীয় সংগীতের ভাষা কি? কোন রূপটা নেওয়া হয়েছে?
২. আমাদের দেশের সরকার স্বীকৃত ক্যালেন্ডারের ভিত্তি কি? কোন্ মাস থেকে বছর শুরু?
৩. ভারতের জাতীয় ফুল কি?
৪. আমাদের দেশের জাতীয় প্রতীক কি? কোথা থেকে নেওয়া?
৫. ভারতের জাতীয় বৃক্ষ কি?

উত্তর : ১. বাংলা। হিন্দিরূপ। ২. শকাব্দ। চৈত্র। ৩. পদ্ম। ৪. উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর কাছে অবস্থিত সারনাথ-এর বৌদ্ধ স্তম্ভের সিংহ। সেখানে ছিল সম্রাট অশোকের রাজধানী। ৫. বটগাছ।

বই কথা কই

ছোটোদের তৈরি লাইব্রেরি

চিরন্তন, শীর্ষ, নীলাদ্রি, শুভজিৎ, প্রথম— পাঁচজন মিলে বছরের শেষে একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলবে। চিরন্তনদের বাড়িতে একটা আলমারি পাওয়া গেছে। ওর দাদু বলেছেন, ওটায় বেশি কাগজপত্র নেই। যা আছে সরিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। আলমারিটা চারফুট উঁচু। লম্বা অনেকটা। দু’জোড়া আলমারি। চারটে পাল্লা দরজা। দুটো পাল্লায় কাঁচ ছিল না। চিরন্তনের দাদু ঠিক করিয়ে দিয়েছেন। বই কোথা থেকে আসবে? প্রত্যেকে বাড়ি থেকে কিছু বই আনবে ঠিক হলো। বাড়িতে এখন অনেক বই আছে যা সবসময় পড়া হয় না। প্রায় দুশো বই চলে এলো। ছোটোরা লাইব্রেরি করছে জেনে কেউ কেউ বই দিলো। যেমন চিরন্তনের দাদু কাকা মামা। শীর্ষর ঠাকুমা। নীলাদ্রির বাবা। শুভজিৎ-এর জেঠু। প্রথম-এর মা আর মামা। পাড়ার রজত জেঠু বড় লাইব্রেরিতে কাজ করে। কাল ২০ ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। ওইদিন তোমরা শুরু করতে পারো। বইয়ের তালিকা তৈরি হয়েছে খাতায়। কোনটা কোন্ বিষয়ের বই তা ভাগ করে সাজানো হয়েছে। নম্বর দেওয়া হয়েছে। খাতায় সেই নম্বর রয়েছে। কোন্ বিষয়ের বই, লেখকের নাম, বইয়ের নাম— এসব লেখা। তার সঙ্গে রয়েছে কত পাতার বই, মাপ কি, কবে বেরিয়েছে। এ কাজটা করে দিয়েছে রজত জেঠু। ২০ ডিসেম্বর লাইব্রেরির উদ্বোধন হলো। নাম দেওয়া হয়েছে পাঠক। লাইব্রেরিতে কোনো চাঁদা দিতে হবে না। প্রতিদিন বিকেলে পাঁচটা থেকে সাতটা খোলা থাকবে। চিরন্তনের দাদু দুটো টেবিল চারটে চেয়ার আর দুটো বেঞ্চ দিয়েছেন। উদ্বোধনের পরে সকলকে দেওয়া হলো একটা করে মিষ্টির প্যাকেট। চিরন্তনের ঠাকুমা ব্যবস্থা করেছিলেন। রজত জেঠু বলছেন, লাইব্রেরি হলো। তা ব্যবহার করতে হবে নিয়মিত। আরও অনেক বই আসবে। সকলে মিলে পড়া নিয়ে মেতে উঠতে হবে। কেননা বইয়ের বিকল্প বই। বই চাই আরও বই চাই। অনেক বই পড়া চাই।’ পাঁচ বন্ধু খুব খুশি। লাইব্রেরির উদ্বোধন অনুষ্ঠান খুব ভালো হওয়ায়।

বইমিত্র

অঙ্গনা

মাতৃত্ব এবং প্রসব সংক্রান্ত সমস্যা

সুতপা বসাক ভড়

গ্রামপ্রধান দেশে অনেক আসন্ন প্রসবা গ্রামীণ মহিলারাই নানা কারণে সরকারি/বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন না। শহরাঞ্চলে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ আসন্নপ্রসবা মহিলারা স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে যান। গ্রামে বা শহরে ওইসব মহিলাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়াই কিন্তু মাতৃত্ব স্বাস্থ্যসেবার শেষ কথা নয়। ওইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী— তাদের ব্যবহার, উপযুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ প্রসব সংক্রান্ত ব্যবস্থা যাতে মা ও নবজাত শিশুর সন্তোষজনক দেখাশুনা, ওষুধপত্র, ইঞ্জেকশন এবং অন্যান্য সামগ্রীর খরচ--- এগুলো সবই বিবেচনাযোগ্য এবং মাতৃত্ব সেবার আওতার মধ্যেই পড়ে।

কিন্তু স্বাস্থ্য সংগঠনের অতি সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, পৃথিবীতে প্রসব সংক্রান্ত মহিলাদের মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন মহিলা ভারতীয়। মাতৃত্ব মৃত্যুর হার কমাবার জন্য ভারত সরকার ২০০৫ সালে 'জননী সুরক্ষা যোজনা' শুরু করে। এই যোজনানুসারে, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব করালে প্রত্যেক মহিলাকে ১৪০০ টাকা দেওয়া হবে। ফলস্বরূপ, মহিলাদের কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় প্রসব করানোর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। UNISEF-এর সমীক্ষানুসারে, ২০০৫-এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের হার ছিল ৫৩ শতাংশ, যা ২০০৯-এ বেড়ে ৭৩ শতাংশে পৌঁছয়।

এখন প্রশ্ন উঠছে যে, এই যোজনার জন্য মহিলাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব করাবার প্রবণতা তো বেড়েছে, কিন্তু সেখানে কি ওইসব মহিলাদের এবং নবজাত শিশুদের যথোপযুক্ত দেখাশুনা বা যত্ন হয়? অনেকক্ষেত্রে মহিলারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বাড়িতে প্রসব করাতে আগ্রহী হন, সেক্ষেত্রে জানা দরকার, কেন এই প্রবণতা? স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং বাড়ির মধ্যে কিসের ব্যবধান থাকে যে জন্য তারা বাড়িতে প্রসব করানোকেই প্রাধান্য দেন।

এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য পাবলিক হেলথ্ ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া-র প্রচেষ্টায় একটি সমীক্ষা করা হয় এবং জানতে চেষ্টা করা হয় যে, প্রসব সংক্রান্ত বিষয়ে মহিলারা কোন কোন ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেন এবং জে.এস.ওয়াই. (জননী সুরক্ষা যোজনা)-র মাধ্যমে এগুলি কতটা পূর্ণ হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের ৫০০ জন সদ্যপ্রসবা মহিলাদের তথ্য নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মহিলাদের প্রসব বাড়িতেই হয়েছে। এরা বেশিরভাগই অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া বর্গের মহিলা। এদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ মহিলাদের পারিবারিক আয় মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বা তার থেকেও কম এবং ওইসব মহিলাদের মধ্যে প্রায় ৫৩ শতাংশ নিরক্ষর।

আসন্ন প্রসবা মহিলারা কেন সময়মত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেননি, তার কারণ যথেষ্ট উদ্বেগজনক। এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মহিলারা সময়মত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেননি, এইজন্যই বাড়িতে প্রসব করাতে বাধ্য হয়েছেন— কারণ হিসাবে খারাপ রাস্তা, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাত্রে যানবাহনের অভাব ইত্যাদি দায়ী।

১৪০০ টাকার অনেক বেশি খরচ হচ্ছে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে— জানালেন ৪০ শতাংশ সদ্যপ্রসূতা মহিলা। এই খরচ মুখ্যত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে থেকে কেনা ওষুধ, ইঞ্জেকশন বাবদ খরচ হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কার্যরত স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরি নেওয়ার প্রবণতাও এর অন্যতম কারণ।

১২ শতাংশ মহিলারা স্বাস্থ্যকর্মীদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেছেন। উপযুক্ত দেখাশোনা, বিশ্রাম এবং নিজস্বতার কথা ভেবে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে দু'জন মহিলা বাড়িতেই প্রসব করানোকে প্রাথমিকতা দিয়েছেন। অবশ্য এদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁদের বাড়িতে ওই বিশেষ মুহূর্তে কোনো পুরুষ মানুষ, প্রয়োজনীয় বাহন বা আর কেউ ছিল না যে ওই মহিলাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা বাড়িতে প্রসব করাতে বাধ্য হয়েছেন।

উপরিউক্ত কারণগুলি থেকে বোঝা যায় যে, এই বিষয়ে সরকারি নির্ণয় বা সংশোধিত যোজনা চালু করার আগে মহিলাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসব সংক্রান্ত সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে এবং ওইসব সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। গরিব পরিবারের, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত প্রসূতিরা যাতে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পান সে ব্যাপারে জননী সুরক্ষা যোজনার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের যথেষ্ট দায়িত্বশীল এবং যত্নবান হতে হবে। যেসব সুযোগ-সুবিধার জন্য মহিলারা বাড়িতেই প্রসবে ইচ্ছুক হন, সেগুলি যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই উপলব্ধ করানো যায়, এবং সঙ্গে এ সম্বন্ধে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাপ্রাপ্ত, সহানুভূতিপূর্ণ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের নিযুক্ত করে সমস্যাগুলির সমাধান করা যেতে পারে।

আমরা জানি যে জননী সুরক্ষা যোজনা চালু হয়েছে ২০০৫ সালে, অথচ এখনও তা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী নয়। এর কারণগুলিও একেবারে অমূলক নয়। সুতরাং এখন ওই কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করে সেগুলিকে সমাধান করতে হবে। এই সমাধানের অনেকটাই আছে (সরকারি আইনের বেশি) স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে। তাঁরা যেন একটু যত্নবান হন আমাদের ভাবী প্রজন্ম এবং তাদের জন্মদাত্রীদের প্রতি। জননী সুরক্ষা যোজনা সার্থক হবে আমাদের আন্তরিক হস্তক্ষেপে।

অতিথি কলম

এ মালিক

গঙ্গা হতে পারে জাতীয় যোগাযোগ পথ

গত মাসেই জাহাজমন্ত্রী নীতিন গড়করির পেশ করা 'ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজ বিল ২০১৫' প্রায় নিঃশব্দেই লোকসভায় পাশ হয়ে গেল। বাজেট সেশনে তুলনায় মান্যতা ও আলোচনার গুরুত্বে অনেক অভিজাত বিলের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ছিল অনেক নিরুত্তাপ। কিন্তু এই বিলটির অন্তর্নিহিত অভিঘাত ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য নিবিড় বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। অতীতের তথাকথিত Express Way হিসেবে ব্যবহৃত হোত যে নদীগুলি, ব্যাপক ব্যবসায়িক পণ্য চলাচল করত যে জলপথে সেই অধুনা বিস্মৃত গৌরবময় জলপথের এক বিস্তীর্ণ পুনর্নির্মাণ ভাবনাই এই বিলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তার ফলে আধুনিক ভারতের যোগাযোগ পরিকল্পনায় এর ভূমিকা হবে অত্যন্ত যুগান্তকারী। 'নমামি গঙ্গে' কোনো ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ভাবনার আচ্ছন্নতা নয়, এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে সারা ভারতের পরিকাঠামো।

"অতীতের তথাকথিত Express Way হিসেবে ব্যবহৃত হোত যে নদীগুলি, ব্যাপক ব্যবসায়িক পণ্য চলাচল করত যে জলপথে সেই অধুনা বিস্মৃত গৌরবময় জলপথের এক বিস্তীর্ণ পুনর্নির্মাণ ভাবনাই এই বিলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তার ফলে আধুনিক ভারতের যোগাযোগ পরিকল্পনায় এর ভূমিকা হবে অত্যন্ত যুগান্তকারী। 'নমামি গঙ্গে' কোনো ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ভাবনার আচ্ছন্নতা নয়, এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে সারা ভারতের পরিকাঠামো।"

বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপের পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গাকে অর্থনৈতিক রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাঁরা এই 'নমামি গঙ্গে' পরিকল্পনাটিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরম্পরা হিসেবে গণ্য করছেন তাঁরা আসলে প্রকল্পটিরই ক্ষতি করছেন। অথচ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে এক ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুত্থান সম্ভব। বিশেষ করে গঙ্গাপথে জনপরিবহণ ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত বহু নদীপথের সংযোগ ও গঙ্গা অববাহিকার উন্নয়ন মোটেই অসম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত, হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ ১৬৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের জলপথটিকে বলা হয় National Waterway। এই দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে গঙ্গাপথে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের অত্যন্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও পরিকাঠামোহীন অঞ্চলগুলি। এই পথটি চলাচলের উপযুক্ত করে দিলে পূর্বাঞ্চলের প্রান্তসীমা থেকে মানুষকে অনায়াসে উত্তরভারতে পৌঁছে দিতে পারবে। অন্যদিকে, বারাণসীতে এসে পড়ার পর প্রেরকরা মালপত্র অনায়াসে রেলের Eastern Freight Corridor আর স্থলপথের গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোডকে পরবর্তী গন্তব্য মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে পারে। ফলে একটি চমৎকার যোগাযোগ শৃঙ্খল তৈরি হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এরপর NW -2 অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে পূর্ববর্ণিত NW-1 এর সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

মোদীর বাংলাদেশ সফরের সময় এ বিষয়টি নিশ্চিতভাবে উঠে এসেছে। উত্তরপূর্বের যুগান্তব্যাপী যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে উত্তর ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এক ঝটকায় সহজ করে দিতে পারে। অকল্পনীয়ভাবে কমে যেতে পারে দূরত্ব। অসম ও অন্যান্য রাজ্যগুলি ব্যাপকভাবে NW- 6 (বারাক) এর ওপর চাপ বাড়াতে বাধ্য হয়। NW-6 এখন অনায়াসে NW-1 এ মিশতে পারে। ফলে তৈরি হতে পারে অসাধারণ সময়োপযোগী 'বারাক-গঙ্গা' জলপথ, যা বয়ে চলবে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে।

এমনই দূরদর্শী NW-5 (ব্রাহ্মণী) ও NW-1 এর সংযোগের নকশা যা ওড়িশার East Coast Canal এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে। এই খালটি উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের নির্মিত হলেও আজ দীর্ঘ অবহেলায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। গোটা খালটি পলি পড়ে প্রবহহীনতার কবলে। তবুও এটিকে পুনরুদ্ধার করা যায়। আর তা করা গেলেই কয়লা, আকরিক লোহা ও ইস্পাত ওড়িশা থেকে উত্তরভারতের দূর বাজারগুলিতে পৌঁছে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ট্রাক বা ট্রেনের কোনো দরকার হবে না, খরচও হবে অনেক কম।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এগুলি কি

অর্থনৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? জলযানগুলি সাধারণত ১৫০০-১৮০০ টন পণ্য পরিবহণ করতে পারে যা একটি মালগাড়ির বহন ক্ষমতার এক তৃতীয়াংশ। এখন পণ্যসামগ্রী গঙ্গাপথ দিয়ে নিয়ে যেতে গেলে জলের গভীরতা বা নাব্যতা অন্তত ৩ মিটার হওয়া আবশ্যিক। বাস্তবে বছরের পর বছর ধরে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও আমাদের অত্যাচারের ফলে গঙ্গা তার নাব্যতা অনেকটাই হারিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পাটনা ও এলাহাবাদের মধ্যে বর্তমানে গঙ্গার গভীরতা ২ মিটারে এসে ঠেকেছে। অবশ্যই এই সমস্যাকে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে এবং প্রযুক্তি বিশারদদের মতে ২ থেকে ৪টি বাঁধ নির্মাণ করে অনেকটা বাগে আনা সম্ভব। এখন এই ব্যাপারটায় রয়েছে বিপুল সম্ভবনা আর স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা চ্যালেঞ্জ যা কেবল 'এসো নদীকে পরিষ্কার রাখি'-র মতো মধুর স্লোগানের থেকে বাস্তবায়িত করা কঠিন।

ধরে নেওয়া যেতে পারে সঠিকভাবে ড্রেজিং করে পলি অপসারিত করলে ও সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ নির্মিত হলে গঙ্গাপথে অর্থনৈতিক বাণিজ্য অনেক বাড়বে। এর ফলে তৈরি হবে সম্ভাব্য চাকরির সুযোগও। অন্যদিকে ১৫০০ টন বহনশক্তির বার্জ বা জলযান তৈরি হবে ভাঙা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে, যে শিল্পটিতে ভারতের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ব্যবহৃত ইস্পাতকে পুনর্ব্যবহার (Reroll) করার ক্ষেত্রে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কার্যকর হবে। এই দেশে নির্মিত বার্জগুলি অভ্যন্তরীণ জলপথে খাদ্যশস্য, সিমেন্ট, ভোজ্যতেল, রাসায়নিক বস্তু অনায়াসে দেশের মধ্যে দেওয়া-নেওয়া করতে পারবে। এর ফলে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের খরচ বাঁচবে, যেমন তেল উৎপাদক সংস্থা থেকে আখমাড়াই করে গুড় বা চিনি তৈরির কলের মালিক বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি অর্থাৎ যারাই গঙ্গার দু'পারে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালাচ্ছে তাদের সবারই সুবিধা হবে। বিষয়টা কল্পনাবিলাস নয়, ইউরোপ বা আমেরিকায় ঠিক এটাই হয়েছে।

অবশ্যই এরকম প্রকল্প সম্পূর্ণ ঝুঁকিহীন বা নির্ঝঞ্ঝাট এমনটা বলা যাবে না। সকলেই জানেন বাঁধ তৈরি হলে জলের প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছোট ছোট নদীগুলিতে জলসঙ্কট ঘটাতে পারে। পক্ষান্তরে জায়গায় জায়গায় জলস্তর বেড়ে গিয়ে নদীর অববাহিকায় চরের জমিগুলিকে ভাসিয়ে দিতে পারে। এই চরগুলি গ্রীষ্মকালে জেগে উঠে কিছু মানুষের চাষবাস করার মাধ্যমে জীবিকার সহায়তা করে। এদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অত্যন্ত রাজনৈতিক পারদর্শিতায় সমাধান দাবি করে।

সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হচ্ছে হাতে-কলমে বড় ধরনের পলি অপসারণের কাজে ভারতের অভিজ্ঞতা খুব বলার মতো নয়। এর পরই আসে ড্রেজিং করে তোলা আবর্জনাকে ফেলা হবে কোথায়? এই বালি মিশ্রিত বর্জ্য কিন্তু বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে খুব কাজ দেয়। কিছু প্রকল্প বিশারদের মতে, গঙ্গার তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের মানুষজনদেরই তা দেওয়া হোক। এরা উৎসাহিত হয়ে 'নমামি গঙ্গে'-এর সফলতায় হাত লাগাবে।

অন্যদিকে পরিবেশ সংরক্ষণবাদীদের সংশয় অন্য কারণে। নদীতে পরিবহনের ফলে— (১) যে তেল নিঃসৃত হবে বা কখনও কখনও উপচে পড়ে নদীর জল দূষণ হওয়াটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। (২) জলযানগুলির প্রপেলারের আওয়াজের প্রভাবে স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ডলফিলগুলির প্রজনন ক্ষমতার ওপর চাপ আসতে পারে।

প্রসঙ্গত, NW1-এর আওতায় বিক্রমশীলা (ভাগলপুর অঞ্চলে) ও বারাণসীতে ডলফিলের প্রজাতি ভালই লালিত হয়। এই ক্ষেত্রে 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে শব্দদূষণ রুখতে বিশেষ প্রযত্ন নিয়ে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে জলদূষণের বিধিগুলিকেও যাতে যুগোপযোগী করা যায় সে বিষয়ে কাজ করতে হবে। চীনের ইয়াংসি নদীতে ডলফিলের ব্যাপক মৃত্যু এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে।

গত ২ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে Inernational Maritime Organization জলযানগুলির ক্ষেত্রে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন তুলনায় কম দূষণ ছড়ায় এমন তেলের ব্যবহারই বাধ্যতামূলক করেছে। গোটা বিষয়টিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে একটি উন্নতমানের জলপথ ব্যবহারের পরিকল্পনা দেশের পরিবহণের সমস্যার বহুবিধ সমাধান করতে পারে। অবহেলিত গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলি যেন সেই সুদিনের অপেক্ষায়। ■

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657,Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি : অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ

অম্লানকুসুম ঘোষ

মানব শরীরের একটি অঙ্গের সঞ্চালন যেমন অন্য অঙ্গের প্রচলনকে প্রভাবিত করে তেমনই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির একটি অংশের প্রয়োগ অন্য নীতিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষত, বিদেশনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, কৃষিনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে ভীষণভাবে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর এবং সেই সফরে হওয়া কিছু চুক্তি ভারতীয় অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে ব্যাপারেই কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করা যাক।

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য-চুক্তি ও তার ফলাফল বিষয়ে আলোচনা করার আগে এই দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক ভৌগোলিক অবস্থান খতিয়ে দেখা জরুরি। গঙ্গা-অববাহিকার ব-দ্বীপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত রয়েছে সাতাশো কিলোমিটার। নদীমাতৃক দু'পারের মধ্যবর্তী সীমানাও অনেকাংশেই নদীপ্রধান, ফলে নিখুঁত সীমানা হিসেবে তার গুরুত্ব নেই। বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয়ের দক্ষিণাংশের পাহাড়ি এলাকা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিসঞ্চিত অববাহিকার দ্বারা গঠিত অসমের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমানা পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার এবং শিবালিক হিমালয়ের অংশবিশেষ ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বের সাতবোনের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমানা দেড়শো কিলোমিটারের মতো। অর্থাৎ তিনদিক দিয়ে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ যেমন পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে একটা বাঁধের মতো অবস্থানরত।

এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই নরেন্দ্র মোদীর বর্তমান চুক্তিটির তাৎপর্য নতুনভাবে ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। বাণিজ্য-চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভারত পণ্য পরিবহণ করতে পারবে। অর্থাৎ পণ্য পরিবহনের করিডর হিসেবে বাংলাদেশের মূল পথকে ব্যবহার করতে পারবে ভারত। এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। প্রথমত, কৃষিসমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের থেকে যাবতীয় খাদ্যবস্তু সহজেই পৌঁছে যাবে উত্তর-পূর্ব ভারতে। ফলে যেখানকার খাদ্যবস্তুর মূল্য হ্রাস পাবে। ফলে একদিকে সেখানকার জনজীবন আরও সহজতর হবে, অন্যদিকে সেখানকার মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে বা চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিয়ে সেখানকার অর্থনীতিকে উন্নততর করবে। অনুন্নয়নের ফসল হিসেবে স্বীকৃত উগ্রপন্থা তখন পিছু হঠতে বাধ্য হবে। অপেক্ষাকৃত শান্ত উত্তর-পূর্বে তখন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যাবে অতি সহজেই। সেই উন্নত পরিকাঠামো একদিকে যেখানে পর্যটনশিল্পের ব্যাপক বিকাশ আনবে, অন্যদিকে সেখানকার খনিসমূহের সঠিক ব্যবহার করে ভারতের শিল্পোন্নয়নের পথ সুগম করবে। সেই খনিজ সম্পদ ভারতের মধ্যভাগে নিয়ে আসার জন্য পুনরায় ব্যবহৃত হবে বাংলাদেশের পণ্য করিডর। খনিজ সম্পদের সঠিক ব্যবহার ভারতের মূল ভূখণ্ডকে শিল্পসমৃদ্ধ করার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের অর্থনীতিতেও আরও সমৃদ্ধি আনবে। ক্রমাগত সমৃদ্ধি উন্নয়নের চক্র সৃষ্টি করবে সেখানে। অর্থাৎ সমৃদ্ধির ফলে আয় বৃদ্ধি— ফলস্বরূপ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, পুনরায় আয় বৃদ্ধি। অর্থাৎ উন্নয়ন ঘটবে আপন গতিতেই। আশা করা যায় উন্নয়নের এই চক্রের ফলে অনুন্নয়নের সুযোগ নিয়ে ঘটা চীনা অনুপ্রবেশ (অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই-ই) বন্ধ হবে। যা অর্থনীতিকে অতিক্রম করে নতুনভাবে সার্থক বিদেশনীতি রচনার কাজে সহায়ক হবে। সেই বিদেশনীতি আবার উন্মোচন

করবে অর্থনীতির নতুন দিগন্তের। এছাড়াও এই বিদেশনীতির ফলে অর্থনীতির কিছু আনুষঙ্গিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। প্রথমত, উত্তর-পূর্বে খাদ্যসামগ্রী যাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ বা অন্যান্য কৃষি উৎপাদনকারী রাজ্যের চাষিরা অধিক উৎপাদনের সময় অভাবী বিক্রি করার হাত থেকে রেহাই পাবে। দ্বিতীয়ত, উত্তর-পূর্বের বনজ-সম্পদ যা বিদেশের বাজারে চড়া মূল্যে বিক্রি হতে পারে (যেমন সোলাকিয়া লঙ্কা, দামি কাঠ ইত্যাদি) তা সহজেই ভারতের যে কোনো বন্দর এলাকায় এনে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আয় করা যেতে পারে। এর ফলে দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার পুষ্ট হবে এবং বাণিজ্যিক ঘাটতি হ্রাস পাবে, যা বাজেটে দেশের অর্থনীতির স্থানাঙ্ক বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করতে সাহায্য করবে। তৃতীয়ত, অসম দিয়ে ঘুরপথে উত্তর-পূর্বে যাওয়ার বদলে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গেলে ভারতে পরিবহণজনিত জ্বালানি ব্যয় হ্রাস পাবে। ফলে পেট্রোলিয়াম আমদানি কমবে। ফলস্বরূপ বাণিজ্যিক ঘাটতি হ্রাস পাবে এবং সরকারি ব্যয় কমে সরকারি আয় ব্যয় ঘাটতিও হ্রাস পাবে। চতুর্থত, অসম ও উত্তরপূর্বের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে একমাত্র যোগাযোগ রক্ষাকারী উত্তরবঙ্গের 'চিকেন নেক'-এর ওপর থেকে সামরিক ও বৈদেশিক চাপ হ্রাস পেয়ে এই অঞ্চলের অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে সহায়ক হবে। স্পর্শকাতর এই এলাকার প্রহরায় নিযুক্ত বিপুল সেনাবাহিনী রাখার খরচ থেকে সরকার রেহাই পাবে, এবং বাংলাদেশের করিডর রক্ষা করবে বাংলাদেশি সেনা-ই। ফলে সরকারি ব্যয় হ্রাস পাবে অনেকটাই যা ব্যয় করে দেশের অভ্যন্তরে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো যাবে প্রচুর। শুধু লাভ নয়, এর ক্ষতির দিকটিও স্মর্তব্য। প্রথমত, বাংলাদেশ সরকারকে মোদী ২০০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছেন মাত্র এক শতাংশ সুদে যার মধ্যে ৫০ কোটি ডলার অনুদান। এর আগে মনমোহন সিংহ সরকারও ১০০ কোটি ডলার অনুরূপ ঋণ প্রদান করেছিল যার মধ্যে ২০ কোটি ডলার অনুদান। এগুলি দিয়ে বাংলাদেশ পরিকাঠামো নির্মাণ করবে। সেই পরিকাঠামো ব্যবহার করে ভারত সরকার পণ্য পরিবহণ করবে। প্রশ্ন উঠছে, পরিকাঠামো একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ভারতীয় অর্থে সেই বন্দোবস্ত করে নিয়ে বাংলাদেশ যদি দু'এক বছর পর ভারতকে আর বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে বাণিজ্যে অনুমতি না দেয়? তখন ভারত সরকারের দু'দিকেই লোকসান। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক হলেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকার সেখানে প্রশাসনের একমাত্র নিয়ামক নয়। ক্ষমতার সেখানে দু'টি কেন্দ্র--- জামাত-এ-ইসলামির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মৌলবাদী-নির্ভর ক্ষমতার দ্বিতীয় কেন্দ্রটি যদি বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তিকে আর আমল না দেয় এবং ভারতীয় পণ্যেরও লুঠপাট শুরু করে? ভারতের পণ্য পরিবহণ তখন তো বাধাপ্রাপ্ত হবেই, উপরন্তু পণ্যসমূহের নাশেও বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, অবাধ পণ্য পরিবহণের সুযোগ নিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে ঢুকে পড়তে পারে যা পুনরায় দেশের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর। এর ফলে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং শ্রমের বাজার অদক্ষ শ্রমিকের বোনাস বাড়িয়ে শ্রমের মূল্যহ্রাস ঘটাবে।

বাণিজ্যচুক্তি ছাড়াও মোদীর ঢাকা সফরে আরও দু'টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অর্থনীতির ওপর তার প্রভাবও খুব কম নয়। প্রথমত, ছিটমহল বিনিময় চুক্তি। ফলে ভারতকে দু' পক্ষেই লোকসানের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ভারতের ছিটমহলগুলি বাংলাদেশে যাওয়ার পর সেখানকার লোকেরা ভারতে চলে আসবে এবং তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন দিতে হবে ভারত সরকারকে। আবার বাংলাদেশের ছিটমহলগুলি ভারতে চলে আসার পর সেখানকার অধিবাসীরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবে এবং তাদের যাবতীয় দায়ভার ভারত সরকারকে বহন করতে হবে। শুধু পুনর্বাসন খাতেই ভারত সরকারের বর্তমান বরাদ্দ ৩০০৮ কোটি টাকা। যারা নাগরিকত্ব পাবে তাদের পেছনে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ তো হিসেবের অতীত, অপরদিকে বাংলাদেশ সরকার ভারতীয় ছিটমহলগুলির জমি পেয়ে যাবে বিনা জনসংখ্যায়। অর্থনৈতিক চুক্তি তাকেই বলা হয় যাতে উভয়পক্ষেই কিছু প্রাপ্তিযোগ থাকে। উভয়কেই কিছু দেওয়ার বদলে কিছু পেতে হয়। কিন্তু এই অদ্ভুত চুক্তিতে ভারত শুধু দিয়ে গেল, পেল না কিছুই। অর্থনৈতিক সামান্য জ্ঞানরহিত এই চুক্তি কোন যুক্তিতে ভারত সরকার সম্পাদন করল তা সাধারণের বোধের অগম্য।

দ্বিতীয়ত, তিস্তা চুক্তি— প্রাক্তন ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (অর্থাৎ নরসিংহ রাও এবং জ্যোতি বসুর) যুগলবন্দিতে সংগঠিত গঙ্গাজল চুক্তি যেমন গঙ্গার জলের বৃহদংশ বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়ায় কলকাতা বন্দর ও দক্ষিণবঙ্গের কৃষির নাভিশ্বাস তুলেছে, তেমনই বর্তমানের তিস্তাচুক্তি উত্তরবঙ্গের কৃষির এবং কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মৃত্যুদিন ত্বরান্বিত করবে। নিশ্চেষ্ট থাকার বদলে সচেষ্ট হওয়া ভাল। বিদেশ-নীতিতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চীনের একাধিক কাজে আঘাত হানতে ভারত সরকার দীর্ঘদিন নিশ্চেষ্ট ছিল। দীর্ঘদিন পর সচেষ্ট হয়েছে। সব পদক্ষেপ নিশ্চয়ই নিখুঁত নয়, কিছু সদর্থক ও কিছু নঞর্থক পদক্ষেপের ওপর নির্ভরশীল এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যতের ভারতীয় বিদেশনীতি ও তার ওপর নির্ভরশীল ভারতীয় অর্থনীতিকে আরও সাহসী করে তুলবে নিঃসন্দেহে। ■

নির্বোধ হুল্লোড়

শেখর সেনগুপ্ত

ফি মাসে একবার কিংবা একাধিকবার লেখালেখির সূত্রে কলেজস্ট্রিটের প্রকাশক মহলে আমি অবিচ্ছন্ন অবিরল ঘুর ঘুর করে থাকি। আমাকে নিরীক্ষণ করলে কারোর বুঝতে ভুল হবার কথা নয়,—বয়সের হিসেবে এ লোকটা ঝুনো নারকেল, গড়পড়তা অফিস-ফের্তাদের দলে আসে না, কেমন ডুবুডুবু কালে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে হাঁড়িকাঠের দিকে। তবুও আদতে কিন্তু আমি আগের চেয়ে অধিক স্বস্তিতে আছি। এক যুগ আগে, যখন ব্যাঙ্কিং সার্ভিসে আমি একজন আমলা, কিছুতেই সময়টাকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারতাম না। এমন কী ছুটি-ছাটাতেও বাড়িতেই ফাইল-পত্তর বিছিয়ে বসেছি। লেখালেখির অভ্যেসে তখন কম-বেশি তেরোটা বেজেছে। একটা ছোটগল্প শেষ করতে পুরো সপ্তাহ ধরে বুঝি শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। মাঝগাঙে ঘুরছে দিশেহারা নাও। সম্পাদক অথবা প্রকাশকের টেলিফোন কালে ভদ্রে এলে খানিক বিহ্বলভাবে স্খলিত স্বরে যেটুকু আমতা আমতা করেছি, তার মর্মার্থ বুঝতে ওই সকল ঝানু লোকদেরও বেশ সময় লাগত। কোনো উপলক্ষে মুখোমুখি হলে গো-চক্ষু ব্যাপিত করে ব্যস্ততার সঙ্গে বলেছি, 'প্রায় মেরে এনেছি, ভাই, আর ক'টা দিন সময় দিন।'

এখন ব্যাপারটা একেবারে উল্টো। অখণ্ড অবসরের মওকায় কলম এমন ছুটছে যে বাজারে সক্রিয় দু'-একজন কলমচি-র চক্ষুশূল হতে চলেছি, যাঁদের অন্তঃকরণে প্রশ্ন জেগেছে আমার কোনো কোনো রচনার ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে। তা যে যা বলবার বলুক, আমি থামছি না। সবুজ অ্যাপ্রন-পরা একজন ডাক্তার যদি দিনে তিনটে-চারটে কঠিন অপারেশন সেরে একপকেট হাই ডিনোমিনেশন নোট নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন, এ শর্মাও পারে এক-দেড় সপ্তাহে এক গণ্ডা গল্প কিংবা একটি মাঝারি মাপের উপন্যাস নামিয়ে দিতে।

সুতরাং বুঝতে পারছেন, কেন আমি এই বয়সে বাস ঠেঙিয়ে মাসে এক বা একাধিকবার কলেজস্ট্রিটের প্রকাশকমহলে ঢুঁ মারি। আত্মসংবরণের বালাই বিশেষ রাখি না। আমি তো আর সেই এলেমের লেখক কিংবা চিত্রকর নই, যাঁর প্রাপ্তির পরিমাণ জানবার পর বিস্ময়ে সাধারণ মানুষের হেঁচকি উঠবে। খুঁটে খুঁটে খাই।

অনেক সময় সেটাও জোটে না। সারাটাদিন কেবল এই দপ্তর থেকে সেই দপ্তর ঘুরে বেড়ানোটাই সার। বাড়ি থেকে বের হই বেলা একটা কি দেড়টায়। ফিরতে ফিরতে রাত দশটা কি সাড়ে দশটা, যখন নগর কলকাতার রাত্রিকালীন নাচানাচি একজোটে শুরু হয়ে গিয়েছে। পদে পদে জ্যাম, কখনও ক্বচিৎ অ্যাম্বুলেন্স অথবা মন্ত্রীর পাইলটকারের বুকফাটা আর্তনাদ। আমার পাড়ি দেবার দূরত্ব যেমন বিশাল নয়, তেমনি খুব কমও নয়। কলেজস্ট্রিট থেকে পুরনো রাজারহাটের প্রবেশদ্বার নারায়ণপুর। বাসে উঠলেই যে সিনিয়র সিটিজেনের সিট একটা পেয়ে যাব, সে সম্ভাবনা সত্যি কম।

গুঁতোগুঁতি, ঝুলতে ঝুলতেও সামাজিক যাত্রীদের সলা-পরামর্শ অব্যাহত।

কিন্তু সেদিন আমার পক্ষে সেটাও সম্ভব হলো না। রাজনৈতিক কলকাঠি তথা কিছু নির্বোধ হুল্লোড়বাজের কল্যাণে আমি সেদিন বড়ই নাস্তানাবুদ। কোন্‌দিকে গেলে যে পরিত্রাণ পাব, বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ঘটনাটা খুলেই বলি।

নির্ভেজাল সত্যি। নেই একরত্তিও অতিরঞ্জন। প্রথমে টেমার লেনে তিন প্রকাশকের সঙ্গে প্রস্তাবের আদান-প্রদান। চায়ের কাপে সিপ। বাংলা গল্প-উপন্যাসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মদনভস্মের মতন যে ভীতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তা নিয়ে খোলাখুলি মত বিনিময়। এরপর অর্ধসমাপ্ত কলেজস্ট্রিট মার্কেটে 'বর্ণপরিচয়'-এ ঢুকে কিছু মাসকাবারি স্টেশনারি গুডস কিনে ঝোলায় ঢোকালাম। সেখান থেকে ক'পা হেঁটে রমাপ্রসাদ মজুমদার লেনে ঢুকে একজন নবীন প্রকাশককে উদ্দীপ্ত করবার প্রয়াস। তারপর বেনিয়াটোলা লেনে আর একজন প্রকাশকের জমাটি আসরে। একগুচ্ছ সদ্য প্রকাশিত বই যেন পেখম তুলে নাচছে। কথা বলতে বলতে বই-পত্রিকা নাড়াচাড়া করতে করতে নেশা ধরে যায়; আর সেই সুবাদে ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে রাত সাড়ে আটটা। অতএব, এবার বাড়ি ফেরার তাড়া— যে যাত্রাপথে কেবল রসকষহীন নয়, একজন বৃদ্ধ নাগরিকের নিকট প্রকৃতই পীড়াদায়ক।

খবর রাখিনি, ইতিমধ্যে আই পি এল ক্রিকেটে উথলে-ওঠা নগর কলকাতা তার নবতম কেলেঙ্কারি— কোঁদল পাইকারি হারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাবৎ ঘরমুখো নাগরিকদের ওপর। কিংখানের বিনিয়োগে দীপ্ত হয়ে ওঠা ক্যালকাটা নাইট রাইডার্স আই পি এল ক্রিকেট যুদ্ধে বাজিমাত করেছে এবং যেহেতু ওখানে 'ক্যালকাটা' শব্দটা লেগে রয়েছে, কলকাতা তো উৎসবে মাতবেই। সেই নাচা-কোঁদা তথা সার্বিক ব্যবস্থাপনা কতটা নিয়মনিষ্ঠ ও রুচিসম্মত, তা নিয়ে ভাবিত হবার দায় কারোর নেই; বিশেষত কিংখান স্বয়ং যখন মঞ্চে উঠে নাচেন এবং মঞ্চে উপবিষ্ঠা স্বয়ং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তা সানন্দে উপভোগ করেন। মাঠের মধ্যে মঞ্চ— যেখানে আনন্দ ও উল্লাসের বর্ণমালা শেষ হরফ অবধি অতি উজ্জ্বল। আর মাঠের বাইরে সাংঘাতিক রণক্ষেত্র— যেখানে হাজার হাজার মানুষ মরিয়া হয়ে ঢুকতে চায় ময়দানের মধ্যে এবং তাদের সাধ্যানুসারে বাধা দিয়ে গিয়ে পুলিশ ক্রমেই হিংস্র। সেই মারদাঙ্গার প্রভাবে বাস ট্রাম ট্যাক্সি সকলই নিরাপত্তার গহ্বর খুঁজে নিতে দিশেহারা। ফলে আমার মতন যাঁরা ছা-পোষা নাগরিক তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পকেটে অপেক্ষমান যে কোনো একটি যানে উঠে ঘরে ফেরার জন্য। হু হু করে সময় গড়ায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকাটাই সার।

আরও বহুজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি শেয়ালদা উড়ালপুলের একদিককার মুড়োয়। ঘড়ির কাঁটা যেমন ঘোরার ঘোরে, সময় গড়ায়, সরকারি বে-সরকারি কোনো বাসের টিকি নেই। আজ যেন কিয়ামতের শেষ দিন। আমরা তো সব পাপাত্মা। প্রশাসন তাই আমাদের ধুনুরির মতন তুলো ধুনো করে ছাড়ছে। কলকাতার নাগরিক জীবনে শাস্তি পাবার এ এক অমোঘ প্রক্রিয়া। স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে আছি। রাজ দশটায় চৈতন্য এল স্ত্রীর ফোন পেয়ে। আমার অবস্থা শুনে সে বিমূঢ়, 'তাহলে ফিরবে কী করে?'

—এবার হাঁটা শুরু করব।

—সে কী! কত মাইল, জানো?

—জানার দরকার নেই। একদল যখন ফুর্তি করে, দাঙ্গা করে, অন্যদের তখন এভাবেই মাশুল গুনতে হয়।

জীবদ্দশায় সে রাতের কথা আমি ভুলব না। শেয়ালদা থেকে রাজাবাজার, রাজাবাজর থেকে ফুলবাগান, ফুলবাগান থেকে কাঁকুড়গাছি, কাঁকুড়গাছি থেকে উল্টোডাঙা, উল্টোডাঙা থেকে লেকটাউন, লেকটাউন থেকে কেষ্টপুর, কেষ্টপুর থেকে জোড়ামন্দির, জোড়ামন্দির থেকে রঘুনাথপুর, রঘুনাথপুর থেকে কইখালি, কইখালি থেকে নারায়ণপুর... এক বৃদ্ধ হাঁটছে, হাঁটছে, হাঁটছে... যেভাবেই হোক তাকে তার ভদ্রাসনে পৌঁছতেই হবে এই রাতে। ■

ত্র্যম্বকেশ্বর মহাকুম্ভ মেলা (নাসিক)-২০১৫

শিবশক্তি সেবাধামের উদ্যোগে নাসিকে ত্র্যম্বকেশ্বর মহাকুম্ভ মেলায় শিবির। ভক্তজনের ভোজন, চিকিৎসা ও থাকার সুব্যবস্থা আছে।

(১) প্রথম শাহী স্নান—২৫ আগস্ট (অনুদান— ৩০০০/- টাকা মাত্র)

(২) দ্বিতীয় মুখ্য শাহী স্নান— ১৩ সেপ্টেম্বর (অনুদান— ৩৫০০/- টাকা মাত্র)

(৩) তৃতীয় মুখ্য শাহী স্নান— ১৮ সেপ্টেম্বর (অনুদান— ৩০০০/- টাকা মাত্র)

(৪) অন্তিম শাহী স্নান— ২৫ সেপ্টেম্বর (অনুদান— ৩০০০/- টাকা মাত্র)

বিশেষ সুযোগ :

(১) ১৩ সেপ্টেম্বর ও ১৮ সেপ্টেম্বর এই দুই স্নানের জন্য অনুদান— ৪৫০০/- টাকা মাত্র।

(২) এক মাসের জন্য অনুদান ১৭,০০০ টাকা মাত্র।

অগ্রিম বুকিং করুন।

শুভমঙ্গলম্‌

হৃষীকেশ ব্রহ্মচারী

শিবশক্তি সেবাধাম, কাশী

ফোন নং-09451268600

শিল্পপতি থেকে সন্ন্যাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ত্যাগেই আসক্তি থেকে মুক্তি মেলে। মুক্তির মধ্য দিয়েই আসে শান্তি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই তত্ত্বে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যেই ত্যাগের ইচ্ছাশক্তি জাগে না। ফলে মুক্তির মধ্যে শান্তির খোঁজ তাদের কাছে অধরাই রয়ে যায়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয়, সেইরকমই এক ব্যতিক্রমী মানুষ ভাঁওয়ারলাল রঘুনাথ দোশি।

আমেদাবাদের ভাঁওয়ারলাল দোশি দিল্লীর এক প্রভাবশালী প্লাস্টিক ব্যবসায়ী। তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমানে তিনি শিল্পপতির তকমা ছেড়ে সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছেন। দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা তাঁর ১৯৮২ সাল থেকে। পরিবারের কথা ভেবে তিনি এতদিন এগোতে পারেননি। অতঃপর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য আমেদাবাদের শিক্ষা সোসাইটি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। গত ২৯ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ, এক হাজার জৈন সন্ন্যাসী। পাশাপাশি ৭ কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে শোভাযাত্রা বের হয়। এই রাজকীয় দীক্ষা গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্যম্ জাহাজে হয়। সেখানে দীক্ষা গ্রহণের সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন হয়। ভাঁওয়ারলাল দোশি জৈন আচার্য শ্রী গুণরত্মম সুরীশ্বরজী মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দোশিজী হলেন তাঁর ১০৮তম শিষ্য। দীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে জৈন আচার্য বলেন, ‘দীক্ষা গ্রহণ এত সহজ কাজ নয়’।

দিল্লীর ‘প্লাস্টিক কিং’ হিসাবে পরিচিত ভাঁওয়ারলাল দোশি। জন্ম ব্যবসায়ী পরিবারে। শৈশব থেকেই ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে তাঁর ওঠাবসা। সেই অর্থে তাঁর পরিবারকে শিল্পপতি পরিবার বলা যায় না। পড়াশোনা শেষ করেই তাঁকে পৈতৃক ব্যবসার হাল ধরতে বলা হয়। কিন্তু তিনি তা না করে মাত্র ৩০ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে নিজস্ব ব্যবসা খুলতে তৎপর হন। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন নিজে যেটা করতে চলেছেন সেটাই ঠিক এবং সাফল্য আসবে তাতেই। এই চিন্তা নিয়ে ভাঁওয়ারলাল সফল হয়েছিলেন পরবর্তী জীবনে। তাই তো তিনি আজ ‘বিলিওনিয়ার’। তাঁর ৩৩ বছরের ছেলে রোহিতকে ইউ কে থেকে এমবিএ পড়িয়ে এনে তাঁর হাতে ব্যবসার ভার তুলে দিয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বাবার এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে রোহিতের বক্তব্য, ‘১৯৮২ সাল থেকে বাবা দীক্ষা নিতে চাইছিলেন। এমনকী ৩ বছর আগেও এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আমাদের পরিবার তখন তাতে সায় দেয়নি। তাই গত ৩ বছর ধরে তিনি সকলকে বুঝিয়ে গেছেন দীক্ষার মাহাত্ম্য সম্পর্কে। আমার বাবা সম্পর্কে আমি এবং আমার পরিবার গর্ব অনুভব করছি।’

শিল্পপতি থেকে সন্ন্যাসী হওয়ার কারণ কী? এ প্রসঙ্গে জানা যায়, ১৯৮২ সালে ভাঁওয়ারলাল দোশি জৈনধর্ম এবং রীতি-নীতি সম্পর্কে গভীরভাবে এক জৈন সন্ন্যাসীর কাছে শোনেন। পরবর্তীকালে তাঁর মনে ভক্তির উন্মেষ ঘটে। তখন থেকে তিনি সিদ্ধান্ত নেন সন্ন্যাস গ্রহণের। আজ আর তিনি ভাঁওয়ারলাল দোশি নামে পরিচিত নন। বর্তমানে তিনি ভব্যরত্ন বিজয় মহারাজ সাহেব নামেই পরিচিত।

শিল্পপতি ভাঁওয়ারলাল দোশি সন্ন্যাস গ্রহণের আগে (বাঁদিকে), সন্ন্যাস গ্রহণের পর (ডানদিকে)।

আমেদাবাদের এই অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি-সহ বহু রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, বিভিন্ন শিল্পপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। তিন দিন ধরে চলা এই অনুষ্ঠানে ২৫ কোটি টাকা খরচ করে দোশি পরিবার। যার ফলে ৩০ হাজার থেকে ১২০০ কোটি টাকার মালিক সন্ন্যাসী হওয়ার পর তাঁর নিজের আর কিছুই রইলো না। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তিনি যখন বিদায় নিচ্ছেন তখন মানুষের মধ্যে রুপোর মুদ্রা দান এবং বিস্তর ভোজনের ব্যবস্থা করে দোশি পরিবার। এক জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই তিনি বিদায় নিলেন সন্ন্যাসী হয়ে মুক্তিলাভের জন্য। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

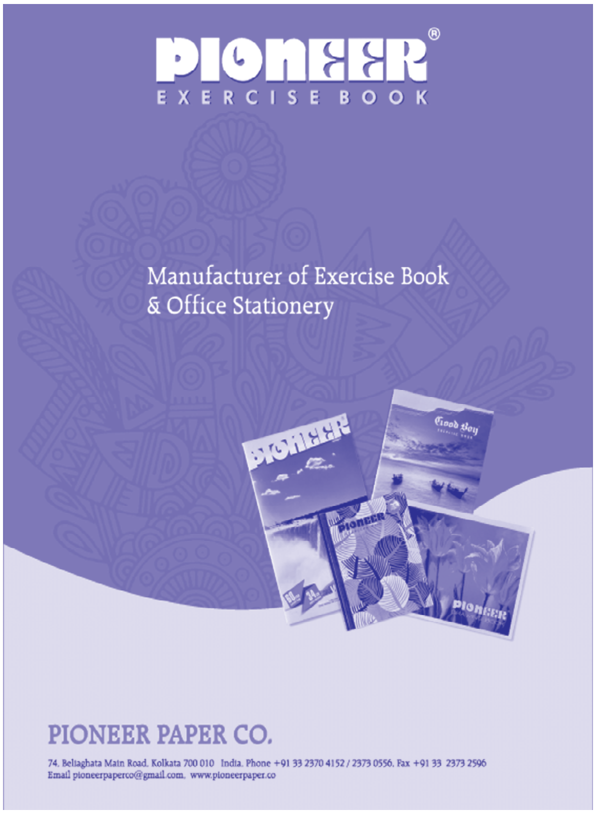

'ভারতীয় নারীগণ অজ্ঞ'— এই অভিযোগ যখন আমরা শুনি, তখন অত্যন্ত গুরুতর এক ভ্রান্ত ধারনার সম্মুখীন হই। শিক্ষার আধুনিক ধারা অনুযায়ী একথা হয়তো বলা যায়, কারণ তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনমাত্র লিখতে জানেন, পড়তেও খুব কম নারীই পারেন। তবে কি তাঁরা অশিক্ষিত? যদি তাই হয়, মহাভারত, রামায়ণ এবং যেসব পুরাণ কাহিনী প্রত্যেক মা, দিদিমা তাঁদের শিশুদের কাছে বলে থাকেন, সেগুলি তবে সাহিত্য নয়? অপরপক্ষে একই যুক্তিতে য়ুরোপীয় উপন্যাস ও কতকগুলি হাল্কা পত্রিকা হল সাহিত্য। আমাদের মধ্যে কেউ কি এ ধরনের বিরুদ্ধ যুক্তি মেনে নিতে পারে? বস্তুত লিখতে জানাই সংস্কৃতির পরিচয় নয়।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

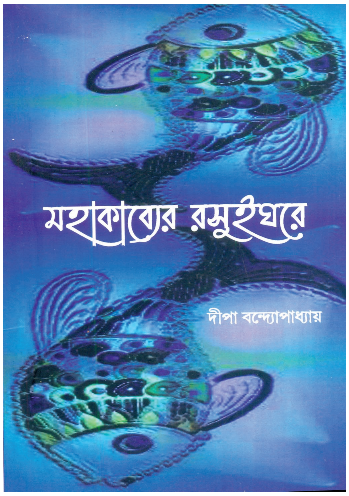

সেকালের রান্নাঘরে

নবকুমার ভট্টাচার্য

ঋক্‌বেদ প্রধানত গ্রামীণ জীবনের জয়গান করেছে যার ছায়া আমরা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে পাই। ২৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতায় প্রথম জনপদ তৈরি হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে যে জনপদগুলি ঐতিহাসিক যুগের প্রথমপর্বে তৈরি হয়েছিল তাদের উত্থানের ইতিহাসও অজানা নয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে প্রথম পরিকল্পিত জনপদ তৈরির কাঠামো পাওয়া যায় তক্ষশিলার সিরকাপনগরের মধ্যে, যেটি ভারতীয় ও গ্রিকরা মিলে তৈরি করেছিল। জনপদগুলিতে প্রথম থেকেই প্রতিটি গৃহের মধ্যেই রসুইঘর অর্থাৎ পাকগৃহের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সেই পাকগৃহগুলিতে অগ্নিকুণ্ডের অস্তিত্বও আবিষ্কৃত হয়েছে। আগুনই মানুষকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কাঁচা মাংসকে ঝলসে খাওয়ার সুবিধাদান করেছে। পরবর্তীকালে সেটি রান্না করে খাওয়ার বিষয়ে পরিণতি লাভ করেছে। রামায়ণে 'পক্ক' শব্দটি দিয়ে রান্না করা খাবারকে চিহ্নিত করেছে। উপনিষদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অন্নই প্রাণস্বরূপ তা বলা হয়েছে। শুধু অন্ন নয়, 'শাকান্ন' শব্দটির ব্যবহারও বৈদিক সাহিত্যে মেলে। অমরকোষের টীকাকার 'শাক' শব্দের ব্যুৎপত্তি এরূপ করেছেন যে, যা দ্বারা ভোজন করতে পারা যায় তা শাক। এই শাক আবার দশ প্রকার— মূল যথা মূলকাদি; পত্র যথা পটোলাদি; বাঁশঙ্কুরাদি, অগ্র যথা বেত্রাদি; ফল যথা কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি, কাণ্ড যথা উৎপল প্রভৃতির নাড়ী অধিরূঢ়ক যথা তালাস্থি প্রভৃতির মজ্জা; ত্বক যথা মাতুলুঙ্গাদি; পুষ্প যথা কোবিদার প্রভৃতি এবং কবকা যথা ছত্রিকা অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি। এই দশ প্রকার খাদ্যবস্তুকে শাক বলে। আমাদের ৬৪ কলাবিদ্যার মধ্যে পাকবিদ্যা অন্যতম। মহাভারতের দ্রৌপদী এবং ভীমসেন পাকবিদ্যায় শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন। রামায়ণের সীতাও রন্ধনপটু ছিলেন কিনা তার উল্লেখ রামায়ণে না থাকলেও এখনও অযোধ্যায় সীতার রসুইগৃহ অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান।

বেদের যুগে ঋষিরা সোমযাগ ছাড়াও আরও দুই শ্রেণীর যজ্ঞ করতেন। এর মধ্যে পাকযজ্ঞ ছিল। পাকযজ্ঞে চরু আবশ্যিক ছিল। সৌত্রামণীযাগে সুরার সঙ্গে মাংস ব্যবহার বিহিত ছিল। পশুযাগে যথাবিধি আনুষ্ঠানিকভাবে পশুবধ করে তার মাংস পাক করে আহুতি দেওয়া হোত এবং যজমান ও ঋত্বিকেরা হবিঃশেষ মাংস ভক্ষণ করতেন। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে, দেবতাকে একটা অংশ আহুতি না দিলে কোনো খাদ্য গ্রহণ করতে নেই। বৈদিক যুগের মানুষেরা পশুবধ করে যথেষ্ট মাংস খেতেন এবং দেবতাকে আহুতি দিতেন। বেদে মৎস্যের উল্লেখ না থাকলেও শ্রৌতযজ্ঞে মৎস্য ব্যবহারের উল্লেখ থাকতে পারে। তবে মনুসংহিতাতে হব্যকর্ম ও দৈব ও পৈত্রাদি কর্মে মৎস্য ব্যবহারের বিধি রয়েছে। তন্ত্রমতে শাল, পঠীন অর্থাৎ বোয়াল এবং রোহিত এই তিন রকমের মৎস্য উত্তম বলা হয়েছে। পাকা, কাঁটাশূন্য, তৈলাক্ত এবং স্বাদু এই চার রকমের মাছ মধ্যম। মধ্যম মাছ দেবী-প্রীতিকর। মহানির্বাণতন্ত্রের মতে অধম মৎস্য বহু কণ্টকযুক্ত। ঋক্‌বেদ এবং রামায়ণে মৎস্যের উল্লেখ রয়েছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে কূর্মও প্রিয়।

মাংস সম্বন্ধে যেসব প্রাণীর মাংস গ্রহণীয় তার উল্লেখ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগুলিতে রয়েছে। ছাগ ও মেষকে বলা হয়েছে গ্রামজ। বরাহ, শজারু, হরিণ, শশক বন্য। গ্রাম্যকুক্কুট, আরণ্য কুক্কুট, গোধা, ময়ূর, তিতির, সারস, রাজহংস, জলকুক্কুট, হংস গ্রহণীয়।

পরশুরাম কল্পসূত্রে তাল খেজুর প্রভৃতি গাছের রস থেকে উৎপন্ন এবং গুড় থেকে উৎপন্ন, ফুল থেকে উৎপন্ন মদ্যের উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যাগে বাজ অর্থাৎ অন্নোদ্ভবসুরা পেয়রূপে ব্যবহৃত হয় বলে বাজপেয় যাগের নাম হয়েছে। সোমরস যে এক প্রকার মদ্য এটি পান করলে প্রচুর নেশা হয় তার স্পষ্ট প্রমাণ বৈদিকমন্ত্রেই মেলে। বৈদিক যুগে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সুরা আহুতি দেওয়া হোত। আর মহাভারতের যুগে নারীরাও মদ্যপানে অংশগ্রহণ করতেন। সংস্কৃতের অধ্যাপিকা দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় বহু অনুসন্ধানে গবেষণাকৃত গ্রন্থ 'মহাভারতের রসুইঘরে' পরিবেশন করেছেন। তাঁর গ্রন্থের সতেরটি অধ্যায়ে রয়েছে সেকালের খাদ্যরুচির নানা কাহিনি, যা আমাদের অনেকের কাছেই অজানা ইতিহাস। গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ প্রণীত 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে আমরা পিষ্ঠক বিষয়ে কিছু তথ্য জেনেছি মাত্র। ড. প্রণব রায় সেকালের খাদ্য তালিকা নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০১ সালে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রকাশ করেছিলেন 'প্রাচীন পাকবিদ্যা' নামে একটি টুকরো গ্রন্থ। তাতে বৈদিক যুগের খাদ্যাখাদ্য নামে একটি অধ্যায় রয়েছে। এই বইটি বহুদিন অপ্রকাশিত হয়ে রয়েছে। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি সেই অভাব মিটিয়ে দিয়েছে। গ্রন্থটির ছাপা এবং ছবি উত্তম এবং বইটির মুদ্রণ-প্রমাদ নেই বললেই চলে।

মহাকাব্যের রসুইঘরে।। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : এভেনেল প্রেস। বর্ধমান। দাম : ১৫০ টাকা।

ন্যায়বিচার—একটি মৌলিক অধিকার

পুলক ঘোষচৌধুরী

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এই তিনটি মানুষের জীবনে মৌলিক অধিকার, এখন আধুনিককালে শিক্ষা ও ন্যায়বিচার মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী, তাই সুস্থ সমাজ রক্ষা করতে গেলে ন্যায়বিচার একান্ত প্রয়োজনীয়। না হলে সামাজিক, মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে নাগরিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে ১৪ (৩) ডি অনুচ্ছেদে যে অধিকার বিচারাধীন বন্দিকে দেওয়া আছে বা হয়েছে, তা হলো— নিজের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের উপস্থিতিতে বিচার অর্জন করা, আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার, যদি সেই ব্যক্তি অর্থের অভাবে আইনি সহায়ক বা উকিল নিয়োগ করতে না পারে, তাহলে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালত বিনা খরচায় আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার যে কোনো ভারতীয় নাগরিকের থাকবে। বিনা খরচায় এই আদালতে যে আইনি অধিকার তার ভিত্তি হলো মানবতা ও সাম্যবোধ। ফৌজদারি মামলায় চূড়ান্ত রায় অর্জনের ক্ষেত্রে ১৪ (৩) অনুচ্ছেদে এই আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকার দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তা শুধুমাত্র ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে বিবেচ্য। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশ মূলক নীতির ৩৯ (এ) অনুচ্ছেদে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবার সহায়তা প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে আইনি ব্যবস্থাপনার পরিচালনায় বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের আইনি বিচার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে। তা আদালত ও দেশকে সুনিশ্চিত করতে হবেই।

মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী যে কোনো দরিদ্র নাগরিকের আইনি সাহায্য দান বা দেওয়া সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের নাগরিক এবং সামাজিক জীবনের অঙ্গ। এ-১-আর-১৯৭৮, এস সি ১৫৪৮, এম-এইচ হোসকট বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলার রায় অনুযায়ী নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের স্বার্থে তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জে কৃষ্ণ আইয়ার বলেন, এল বি আই ভি ১৫৫৬ অনুযায়ী পূর্ণ ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই দরিদ্র অভাবী ফৌজদারি মামলায় কারাদণ্ড বন্দিদের জন্য কৌঁসুলি নিয়োগ করার বিধান সংবিধানে ২১ এবং ৩৯ এ অনুচ্ছেদের ১৪ নং ধারায় বিশদে দেওয়া আছে। সংবিধানের ৩৯ এ বিধানকে কার্যকর করতে '১৯৮৭ আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ' বলে একটি আইন প্রণীত হয়। দরিদ্র মানুষকে আইনি পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই কর্মসূচীর উদ্যোগ অবশেষে ১৯৯৩ সালে ৯ই নভেম্বর থেকে এই আইন কার্যকর হয়। ১৯৯৫ সালে ৫ ডিসেম্বর একটি আইনি বিধিবদ্ধ সংস্থা তৈরি হয়, তার নাম দেওয়া হয় 'জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ' অথবা 'ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি' বা এক কথায় NALSA।

যথাযথ আইনি বিধান অনুযায়ী আইনি পরিষেবা সংক্রান্ত নীতি নির্দেশিকা তৈরি এবং আইনি পরিষেবা যাতে ব্যয়বাহুল না হয় তা দেখার দায়িত্ব 'নালসা'র উপর বর্তায়। এই আইনে ৩ (২) (এ) ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি 'নালসা'র প্রধানপৃষ্ঠপোষক হবেন এবং সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নালসার কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান রূপে মনোনীত হবেন। এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি --- এইচ এল দাত্তু সর্বভারতীয় প্রধানপৃষ্ঠপোষক এবং সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম মাননীয় বিচারক টি এস ঠাকুর এই 'নালসা'র সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান।

এই আইনের ৬ (২) ধারার জন্য রাজ্যস্তরে 'নালসা'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক হবেন ওই রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান প্রধান বিচারপতি। উক্ত আইনের ৯ (১) এ ৯ (২) ধারায় সংশ্লিষ্ট জেলা জজ পদাধিকার বলে 'নালসা'র জেলার চেয়ারম্যান হবেন। এই আইনের ১১ (এ) ধারায় ব্লক বা মণ্ডল স্তরে কমিটি গঠন ও লোক আদালতের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে। উক্ত আইনের ২ (১) সি ধারায় বলা হয়েছে যে 'নালসা' আদালত কর্তৃপক্ষ বা ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মামলা প্রক্রিয়ায় সমাজের দরিদ্র অসহায় মানুষদের যে কোনো আইনি পরামর্শ দান বা সাহায্য করার ক্ষেত্রে 'নালসা' সম্পূর্ণ ভাবে দায়বদ্ধ। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখার জন্য ন্যায়বিচার, মূল্যবোধের সম্যক দিক্ নির্ণয় করা হয়েছে এই 'নালসা'র মাধ্যমে। যাতে এই স্থায়ী আইনের মাধ্যমে সমাজের পাঁচটি ক্ষেত্র খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, ন্যায়বিচার বজায় থাকে।

আন্তর্জাতিক স্তরে ২০১২ সালে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় আইনি সহায়তার সুযোগ বিষয়ক রাষ্ট্রসঙ্ঘ নীতি নির্দেশিকা সমূহের একগুচ্ছ নীতি নির্ধারণ করে। ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক শর্ত হলো আইনের সাহায্য পাওয়া। ■

লোকভাষা হতে চলেছে সংস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ হলো বেদ। বহুদিন পর্যন্ত বেদের কোনো মুদ্রিত সংস্করণ ছিল না। বেদ মুখে মুখে পড়ানো হোত। মহাভারতের যুগে পরাশর ঋষির পুত্র ব্যাসদেব বেদকে চারভাগে ভাগ করেন। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ অর্থাৎ উপনিষদ, আঠারো পুরাণ, বিভিন্ন ঋষিমুনিদের দ্বারা সম্পাদিত বেদের ভাষ্য, রামায়ণ-মহাভারত রচিত হয়েছে। যা পৃথিবীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণ করেছে।

ভারতব্যাপী যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা আর বিষয় ও পাঠদানের মাধ্যমও ছিল সংস্কৃত। ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে, লোকভাষা হিসেবে সংস্কৃত প্রচলিত ছিল। এর সপক্ষে শাস্ত্রীয়, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশের সর্বসাধারণের কথা, ব্যবহারিক ও সর্বাধিক সাহিত্যের ভাষা কেবলমাত্র সংস্কৃত ছিল।

ওই সময়ে অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্য উপলব্ধ হয়নি। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যও ওই সময়ে সংস্কৃতেই রচিত হয়েছিল। আদি শঙ্করাচার্যের শিষ্যগণও সংস্কৃতেই যাবতীয় কথাবার্তা চালাতেন। ওই সময়কার এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন কুমারিল ভট্ট। মণ্ডন মিশ্র একজন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর বাড়ির পোষা শুকপাখিও অতিথি অভ্যাগতদের সংস্কৃত ভাষায় অভ্যর্থনা করত। সাধারণ মানুষ সংস্কৃতেই কথা বলত।

খৃষ্টপূর্বে দ্বিতীয় শতকে ‘পতঞ্জলির মহাভাষ্য’ রচিত হয়। এই মহাভাষ্যের ভাষা সংস্কৃত। অনেকে বলেন, সংস্কৃত কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের ভাষা। এটা ঠিক নয়। যে কোনো সংস্কৃত নাটকে দেখা যায়,সেখানে সাধারণ পাত্র-পাত্রীদের (নাটকের চরিত্র) মুখেও স্বাভাবিক সংস্কৃত ভাষাই রয়েছে। প্রাচীন ধ্রুপদী নাটক বা সাহিত্যে দেখা যায় হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতাদেবীর সঙ্গে প্রাকৃত ভাষায় কথা বলছেন। অর্থাৎ সকলে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত বুঝতেন। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আজ সংস্কৃতের এমন করুণ অবস্থা কেন? বিগত জনগণনার সময়ে ভারতবর্ষের মাত্র ৫০ হাজার মানুষ তাঁদের মাতৃভাষা ‘সংস্কৃত’ লিখিয়েছেন।

বৈদেশিক আক্রমণকারীরা যুদ্ধে জয়লাভ করে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিজিত দেশের অধিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দেয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই ঘটনা প্রায় হাজার বছর যাবৎ ঘটেছে। ইসলামি আক্রমণে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করা হয়েছে। ইংরেজরা এদেশের শাসন ক্ষমতায় চেপে বসে ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির বদলে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি ভারতবর্ষে প্রচলন করেছে। তার ফলে সংস্কৃত শিক্ষার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতকে ব্রাত্য করে ইংরেজিকে ঢোকানো হয়েছে।

যখনই কোনো কিছু ‘অমূল্য’ হয় তখন তাকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়। সংস্কৃতের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। মাত্র পাঁচ শতাংশ মানুষের জন্য সংস্কৃত ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ফলে ৯৫ শতাংশ মানুষই সংস্কৃত বিস্মৃত হয়।

আমার ছেলে সংস্কৃত পড়লে জীবিকা অর্জন করতে পারবে না। আমি সংস্কৃত পণ্ডিত, অথচ আমার ছেলেকে আমি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়াবো —এই মনোভাবও সংস্কৃতের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে। এই মনোভাবনা সৃষ্টির পিছনে সংস্কৃত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দুরবস্থা ও সরকারি অবহেলাই প্রধান কারণ। যে সকল মঠ-মন্দির, টোল-চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে সংস্কৃত পঠন-পাঠন চলত তারাও ওসব তুলে দিয়ে যাত্রীনিবাস বা ধর্মশালা নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী। কেননা, সেক্ষেত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জন সম্ভব।

শুধু অর্থ উপার্জনের নেশায় বুঁদ না হয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রচলনে আজ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে আশার কথা, সংস্কৃত ভারতীর মতো বিভিন্ন সংগঠন সংস্কৃতকে কথ্য ভাষায় প্রচলন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে ইতিবাচক ফলও মিলছে। এই প্রজন্মের বহু ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে সংস্কৃতে সাবলীল ভাবে কথা বলছে। এরকম অনেক পরিবার তৈরি হয়েছে যারা বাড়িতে সংস্কৃতে কথোপকথন চালান।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

যোগের দ্বারা বিশ্বের কল্যাণ হোক...

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

টেস্ট ক্রিকেটই সনাতন এবং চিরন্তনী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যার নেভিল কার্ডাস বেঁচে থাকলে আজকের এই টি-২০ ক্রিকেটের যুগে নির্ঘাত জ্যান্ত অবস্থায় কবরে মুখ লুকোতেন। ক্রিকেট আর ক্লাসিকাল মিউজিককে যিনি জীবনের এপিঠ আর ওপিঠ বলে মনে করতেন, তাঁর কাছে এই ধামাকা ক্রিকেট ক্যান্সার যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকার সামিল, এমনটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। ক্রিকেটের আদি যুগে ডব্লু জি গ্রেস থেকে ভিক্টর টাম্পার হয়ে ডন ব্রাডম্যান, লেন হাটন, নীল হার্ভে, থ্রি ডব্লু ওবেল, উইকস, ওয়ালকট, গ্যারি সোবার্স পর্যন্ত বিশ্ব ক্রিকেটের ধ্রুপদী যুগে সব রথী-মহারথীরা যাঁর স্তুতি বা সমালোচনায় টেস্ট ক্রিকেট ও জীবনের ছন্দ খুঁজে পেতেন, তারাই বা কতটা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতেন এই ছন্দ-মাত্রা বর্জিত টি-২০ বা ৫০-৫০ ম্যাচের রমরমার যুগে।

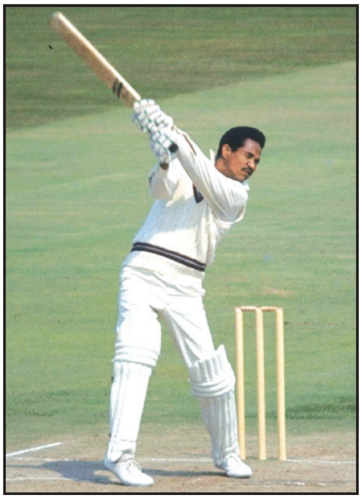

গ্যারি সোবার্স

বিরাট কোহলি

কেরি প্যাকার যখন সেরা তারকাদের নিয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেট সিরিজ চালু করে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন ক্রিকেট বিশ্বে তখন তার দেশেরই বিখ্যাত প্রাক্তনী বিল ও বিলি এর নাম দিয়েছিলেন পাজামা ক্রিকেট। তার সমসাময়িক আর্থার মেইলি যিনি ক্রিকেটার জীবন শেষ করে হাতে কলম তুলে নেন এবং কার্ডাসের মতোই সর্বজনশ্রদ্ধেয় সমালোচকের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন, এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেছিলেন— এ হচ্ছে জোকার সর্বস্ব ক্রিকেট। বস্তুত কেরি প্যাকারের হাত ধরেই পরবর্তী কালে একদিনের ক্রিকেট সব ক্রিকেট খেলিয়ে দেশেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কমতে থাকে টেস্ট ক্রিকেটের আকর্ষণ। এখন তো আবার আরো ক্ষুদ্র সংস্করণ টি-২০-এর যুগ। ক্রিকেটের যাবতীয় ব্যাকরণ-প্রকরণের জলাঞ্জলি দিয়ে এক নীতিহীন নিয়মমাত্রা বহির্ভূত ফর্মাটের সংস্কৃতি।

ভোগবাদের আবহে বিজ্ঞাপন-বিপণনই আজ বিশ্বক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আই সি সি-র একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ক্রিকেটের এই বেনিয়াকরণ ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আর সনাতনী ক্রিকেটের আঙ্গিকে খেলাটিকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে না। ফলে টেস্ট ক্রিকেট চরম অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়বে। টেস্ট ক্রিকেটই যে জীবনের প্রতিফলিত রূপ। সি এল আর জেমস— চিরশ্রেষ্ঠ ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট লিখিয়ে তথা অগ্রণী 'স্টেটসম্যান' একবার মন্তব্য করেছিলেন— টেস্ট ক্রিকেট সবদিক থেকেই জীবনের সারবত্তাকে তুলে ধরে। শুধু একজন ক্রিকেটারের সার্বিক ক্রিকেটিয় দক্ষতা ও প্রতিভার মাপকাঠি যেমন টেস্ট ক্রিকেট তেমনি খেলার বাইরে যে বৃহত্তম জীবন, তার পরতে পরতে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমও টেস্ট ক্রিকেট।

বডিলাইন যুগে ভয়ঙ্কর ফাস্ট বোলার হ্যারল্ড লারউড বিল ভোসের বিরুদ্ধে ডন ব্রাডম্যান, বিল নন্সফোর্ডদের যে বুক চিতিয়ে লড়াই ব্যাট-বলের রোম্যান্টিক কিন্তু আগ্রাসী দ্বৈরথ ক্রিকেটকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। কিংবা পঞ্চাশ-ষাট দশকের সেইসব গ্রেট মাস্টারদের অত্যাশ্চর্য কীর্তিকলাপ যা টেস্ট ক্রিকেটের মাহাত্ম্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই সময়টাই টেস্ট ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রায় সমান শক্তিশালী দল হিসেবে রাজত্ব করেছিল। তিনটি দলেই ব্যাটিং-বোলিং দু'বিভাগেই অসাধারণ মানের সব খেলোয়াড় ছিলেন। টেস্ট ক্রিকেটের সম্রাট স্যার গ্যারি সোবার্স এই সময় নিজেই এক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন। এই তিন দেশ ছাড়া পাকিস্তানও যথেষ্ট ভাল টিম ছিল। তখন অবশ্য ভারতীয় দল ততটা সুসংহত ক্রিকেট উপহার দিতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু উঁচুমানের খেলোয়াড় থাকলেও একটা পরিপূর্ণ দল হয়ে উঠতে পারেনি। আবার ষাটের দশকের শেষ দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন শক্তি বৃদ্ধি করছে ঠিক তখনই বর্ণ-বৈষম্যের মদতদাতা দেশ হওয়ার সুবাদে টেস্ট ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হয়ে যায়। তাই ক্রিকেট বিশ্ব গেম পোলক, ব্যারি রিচার্ডস মাইক প্রোক্টরদের মতো চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারদের শৈলী ও বিক্রম দেখা থেকে চিরকালের মতো বঞ্চিত থেকে যায়। এরা অবশ্য প্যাকার সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলেছেন ২-৩ বছর কিন্তু তা দেখেছেন শুধুমাত্র চ্যানেল টেনের দর্শকরা। আর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে হাজির হওয়া ক্রিকেটীয় ভক্তরা। ∎

শব্দরূপ-৭৫২ শামাপ্রসাদ দাশ

■	১			■	২	৩	
৪		■	■	৫			■
৬					■	■	৭
৮		■	■	৯		১০	
১১			১২	■	■	১৩	
	■	■	১৪				
■	১৫	১৬		■	■	১৭	
১৮			■	১৯			■

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** মৈত্রেয়ী দেবীর বিখ্যাত উপন্যাস, ন—, **২.** অন্বেষণ, **৪.** '—' প্রয়োগ, **৫.** সুকান্তের কবিতা, ভাবী, **৬.** কথার দ্বারা বোঝানো যায় না, **৮.** '—দিনতো গেল...', **৯.** অধীন, **১১.** হোমরা চোমরা, **১৩.** গুণবিশেষ, **১৪.** জয়দেব মেলার মুখ্য আকর্ষণ, **১৫.** চোয়ানো মদ, **১৭.** দানশীল, **১৮.** কার্যালয়, **১৯.** ইংরেজি গদ্য সাহিত্যের জনক।

উপর-নীচ : **১.** বাণভট্টের রচনা, **২.** মন্ত্রপূত তাবিজ বা সুতো, **৩.** হস্তিনী, শৃগালী, **৪.** চিরপ্রচলিত, **৫.** সূর্যকিরণ, **৭.** সবার মাতা, **১০.** ভাগচাষি, **১২.** রুদ্রবীণা, **১৫.** প্রাপ্ত, প্রামাণিক, **১৬.** দিঘি, হ্রদ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪৯
সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
নগেন রায়
বিন্নাগুড়ি,
জলপাইগুড়ি

■	■	দে	বী	প	ক্ষ	■	উ
গো	ম	য়	■	■	ণ	■	ত্ত
■	গু	■	■	■	দা	দ	রা
অ	ন	ড্ডা	ন	■	■	গু	■
■	মি	■	■	কী	র্তি	না	শা
আ	শ্র	ম	■	■	■	য়	■
দি	■	ঞ্জি	■	■	নে	ক	ড়ে
ত্য	■	স	ং	স্থি	তা	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৫২ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ জুলাই ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ২৯

আলোয় ফিরল বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ চোদ্দ বছর পর প্রযুক্তির জাদুকাঠির ছোঁয়ায় এক রাতের জন্য আবার জীবন্ত হয়ে উঠল আফগানিস্তানের হজরকত উপত্যকার বামিয়ান গুহা। বর্তমান সময়ে আই এস আই এস দ্বারা বহু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ধ্বংসের

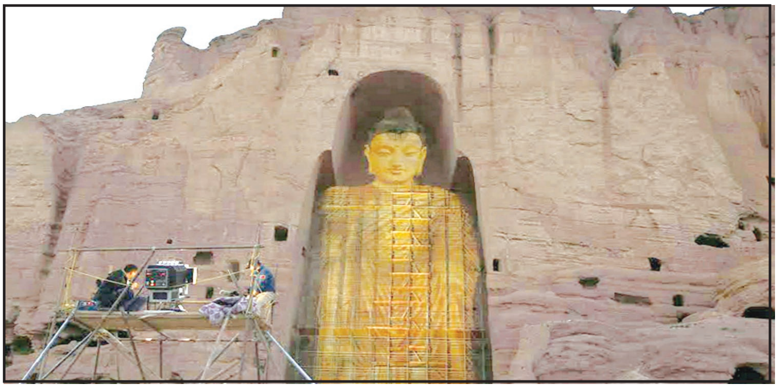

পূর্বেই ২০০১ সালে সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছিল কোরাণ—হাদিস সর্বস্ব ইসলামি মৌলবাদের এক নগ্ন রূপ। ওইদিন ধর্মান্ধ তালিবানদের ইতিহাস অজ্ঞতার কাছে হার মেনে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল শান্তি, করুণা ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক ভগবান বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তিটি। আল্লাহ্-এর অংশীদার অর্থাৎ শির্ক প্রতিষ্ঠা ইসলাম বিরোধী হওয়ায় ও মূর্তি পূজারীদের উপাস্যের প্রতি প্রবল ঘৃণায় ইউনেস্কো স্বীকৃত পনেরোশো বছর পূর্বে নির্মিত এই অনুপম আশ্চর্যটিকে কামান দেগে নিশ্চিহ্ন করেছিল তালিবানরা। অবশেষে এতগুলি বছর কেটে যাওয়ার পর একটি রাতের জন্য থ্রিডি লেজার লাইটের সাহায্যে অবিকল বুদ্ধমূর্তির আবার প্রতিষ্ঠা হলো সেই গুহায়, চীনা দম্পতি জনসন ইউ ও লিসান ইউ গত ৭ জুন লেজার লাইটের সাহায্যে গুহার ওই শূন্যস্থানটিকে পুনরায় ভরাট করেন।

জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা হটানো হবে : রাজ্যবর্ধন রাঠোর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২২ মে বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় সূচনা ও প্রসারণ প্রতিমন্ত্রী রাজ্যবর্ধন রাঠোর বলেন যে, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ৩৭০ ধারা হটানোর ব্যাপারে বিজেপি-র কোনো দ্বিমত নেই। এবং তা সঠিক সময়ে ও রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে কার্যকর করা হবে। উল্লেখ্য, এনডিএ সরকারের এক বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সি এন এন-আই বি এন আয়োজিত 'Modi 365' নামে আলোচনায় শ্রীরাঠোর গত এক বছরে মোদী সরকারের ভালো কাজের উল্লেখ করে বলেন, ভারতীয় জনতাপার্টি কাশ্মীর বিষয়ে নিজের মত থেকে পিছু হটেনি, উপযুক্ত সময়েই তা রূপায়ণ করা হবে।

ভারত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরমাণুশক্তিধর দেশগুলির মধ্যে একটি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাকিস্তানের নেতারা ভারতের উপর পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে গত ১৩ জুন ভারত তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। পরমাণুশক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২০২৩-'২৪ সালের মধ্যে দেশের পরমাণুশক্তি তিনগুণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন। পরমাণুশক্তি নিগম ২০১৪-'১৫ সালে ৩ হাজার ৭০০ কোটি ৫০ লক্ষ ইউনিট শক্তি উৎপাদন করেছে যা আজ পর্যন্ত সর্বাধিক উৎপাদন। শ্রী সিংহ আরো বলেন, সরকার অসামরিক পরমাণু ক্ষেত্র বৃদ্ধির জন্য অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পরমাণুশক্তি সমঝোতা চুক্তি করেছে। পরমাণুশক্তি উৎপাদন স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে— এই যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেন, বর্তমান গবেষণায় এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, পরমাণুশক্তি বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনার জন্য দিল্লীতে একটি 'নিউক্লিয়ার হল' স্থাপন করতে চলেছে সরকার।

৪৩০০ হিন্দু ও শিখকে নাগরিকত্ব দিল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা ৪৩০০ হিন্দু ও শিখকে নাগরিকত্ব প্রদান করলো ভারত। প্রায় দু' লক্ষ শরণার্থীকে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ এটি। উল্লেখনীয় যে, ইউপিএ-২ এর শাসনকালে কেবলমাত্র ১০২৩ জনকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির 'ভারত অন্যদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা হিন্দুদের স্বাভাবিক ঘর' নীতির এটিই প্রথম পদক্ষেপ। গত ১৫ জুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের উপস্থিতিতে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের প্রথম পদক্ষেপ কার্যকরী হলো। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর শরণার্থী হিন্দুদের ভারতের নাগরিকত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি যে কথার কথা ছিল না— এটাই তার প্রমাণ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, ২০১৪ সালের মে মাসে মোদী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মধ্যপ্রদেশে ১৯০০০, রাজস্থানে ১১০০ এবং গুজরাটে ৪০০০ শরণার্থীকে দীর্ঘকালীন ভিসা দেওয়া হয়েছে। উত্তরপূর্বাঞ্চলেও শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া জোর কদমে চলছে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
22 June - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা